কালজয়ী পুরুষ

জাতীয় অধ্যাপক

ডাঃ নুরুল ইসলাম

জামাল উদ্দিন / শরীফা বুলবুল সম্পাদিত

বলাকা

বাঙালী পুরুষ

জাতীয় অধ্যাপক
ডাঃ নুরুল ইসলাম

কালজয়ী পুরুষ
জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম
জামাল উদ্দিন / শরীফা বুলবুল সম্পাদিত

প্রকাশকাল
একুশের বইমেলা
ফেব্রুয়ারি ২০০৪

স্বত্ব
বলাকা

প্রচ্ছদ
খালিদ আহসান

প্রকাশক
বলাকা
৪০ মোমিন রোড, কদমমোবারক মার্কেট, চট্টগ্রাম।
© ০১৮-৩২৬২৭১

বর্ণবিন্যাস
মাহতাব শফি

পরিবেশক
কারেন্ট বুক সেন্টার
জলসা মার্কেট, চট্টগ্রাম। © ৬১৪৪৭৩

Kaljoye Purush Jatio Adhyapak Dr. Nurul Islam
Edited by Jamal Uddin / Sharifa BulBul
Published By Balaka
February 2004
40 Momin Road. Chittagong. © 018326271

একশত বিশ টাকা $ 5

ISBN-984-8433-08-2

বলাকা'র প্রকাশিত অন্যান্য বই

ও মাটি ও শূন্যতা (কাব্য) হোসাইন কবির
কাঠ চেরাইয়ের শব্দ মাপছি দুপুরে (কাব্য) রিজোয়ান মাহমুদ
মহলের উল্টো দিকে (কাব্য) সাজিদুল হক
বুক পকেটের খাম (কাব্য) বিকাশ মজুমদার
অন্ধকারবেলা (কাব্য) রহমান হেনরী
মানুষ মানুষ নয় হোমোসেপিয়ানস (কাব্য) ফুয়াদ হাসান
অন্যরকম আকাশ চাই (কাব্য) চঞ্চল চৌধুরী
ছিঁড়ে যায় সম্পর্কের সুতো (গল্প) শরীফা বুলবুল
অনুভব (গল্প) এলিজাবেথ আরিফা মুবাশ্‌শিরা
আহমদ ছফার অন্দরমহল (প্রবন্ধ) শামসুল আরেফীন
পুঁথিসুরে সমকাল (ছয় তরুণের কাব্যগ্রন্থ) শরীফা বুলবুল সম্পাদিত
হুমায়ুন আজাদ : এই বাঙলার সক্রেটিস
(জামাল উদ্দিন ও শরীফা বুলবুল সম্পাদিত)
বিশ্বজনীন বাঙালী ড. কামাল হোসেন
(জামাল উদ্দিন ও শরীফা বুলবুল সম্পাদিত)
চট্টগ্রামের নারী লেখক
(জামাল উদ্দিন ও শরীফা বুলবুল সম্পাদিত)
কাঙালের বাসি কথা (প্রবন্ধ) মোহাম্মদ হোসেন খান
কথাসাহিত্য ও অন্যান্য (প্রবন্ধ) মহীবুল আজিজ
মৎস্যপুরাণ (গল্প) মহীবুল আজিজ
হরপ্পার চাকা (কাব্য) মহীবুল আজিজ
আদিনাথ মন্দিরের ইতিকথা (ইতিহাস) মুহাম্মদ আব্দুল বাতেন
ম্রো উপজাতির জীবনধারা (ইতিহাস) মুহাম্মদ আব্দুল বাতেন
অনন্তর জেগে থাকে দীঘল পিপাসা (কাব্য) সাইদুল ইসলাম
যাবে হে মাঝি, দিকশূন্যপুর (কাব্য) চন্দন চৌধুরী
আমি সেই দুঃখবাহী নদী (কাব্য) শরীফা বুলবুল
দহনের ৮৩৫দিন (কাব্য) শরীফা বুলবুল
আমার আকাশ সরকারি নয় (কাব্য) শরীফা বুলবুল
এক পলকের দেখা (গল্প) আশীষ কুমার
পারমিতার বিস্ময় (গল্প) শাহানা আকতার
নক্ষত্রহীন রাতে (কাব্য) এলিজাবেথ আরিফা মুবাশ্‌শিরা
রোদ নেচে নেচে যায় মেঘের ঘোমটা পরে (কাব্য) সুনীল নাথ
চিত্রার্পিতার নির্বাক পৃথিবী (কাব্য) বিকাশ মজুমদার
একঝাঁক রোদেলা সকাল (কাব্য) বিকাশ মজুমদার
মোহিনী (উপন্যাস) মনওয়ার সাগর
সিন্দাবাদের অষ্টম সমুদ্র যাত্রা (কিশোর গ্রন্থ) শাহনেওয়াজ বিপ্লব
সন্ত্রাস চারিদিকে (ছড়া) যিশু রায় চৌধুরী

প্রাককথন

তীব্র মেধা এবং অধ্যবসায় যে মানুষটিকে সফলতার চূড়ায় তুলেছে তিনি জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম। যেখানে মিথ্যের বেসাতী চলে সেখানে তিনি উদ্ধত শিরে কথা বলেন। বলা যায় সবরকম অন্যায়ের শিকড় ধরে টান দিচ্ছেন তিনি তাঁর সময়ের সবচে দুঃসময়ের দিনগুলোতে। তাই সবার কাছে প্রিয় নন তিনি কারো কারো কাছে প্রিয়, কেননা তিনি দেশের ক্ষতিকারকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিদ্রোহে কখনোই সংহত নন। বরং আবির্ভূত হন কারো কারো কাছে এক নম্বর শত্রু হিসেবে। কারণ তাঁর কারণে অনেকেরই সোনালি স্বার্থ বিপন্ন হয়। ডা. ইসলামই কোনো লৌহমানব বা শক্তিকে পরোয়া না করে উচ্চ কণ্ঠে তীব্র গলায় তথাকথিত ডাক্তারদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। এমন নির্ভীক প্রতিবাদ তিনি ছাড়া আর কে করতে পারবেন ? সাহসই তাঁর এ সততার চিহ্ন। তাঁর বিরুদ্ধে সুবিধাবাদীরা কখনোই শক্ত মেরুদন্ডে কিংবা উদ্ধত হতেই পারেন না। তাই দেখা যায় আমাদের সমাজের অনেক ডা. তাঁকে দেখে থাকেন খুব ভয়ের চোখে। প্রচন্ড ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী তিনি। এই স্বাতন্ত্রবাদই তাঁকে শ্রদ্ধেয় করে তুলেছে দেশে বিদেশে এবং ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর জীবনের অসংখ্য উপাখ্যান। বললে অত্যুক্তি হবে না তিনি আমাদের চিকিৎসা জগতের জীবন্ত কিংবদন্তী কিংবা বলা যায় তিনি বাঙলার ইবনে সিনা।

চিকিৎসা জগতের এই জীবন্ত কিংবদন্তী পিজি'র ডাইরেক্টরের পদটি সুদীর্ঘ ২৩টি বছর ধরে অলংকৃত করে রেখেছেন। তিল তিল করে তিনি সন্তানের মতো এই পিজিকে গড়ে তুলেছেন। ধুমপান বিরোধী আন্দোলন, (আধূনিক)যক্ষ্মা নিরোধ আন্দোলন থেকে শুরু করে এবং দেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারী চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সহ তিনি জাতির জন্য কী-না করেছেন। এর প্রভাব আজ বহুদূর বিস্তৃত হয়েছে। এমনকি তাঁর কোনো কোনো কাজের কারণে তিনি পৌঁছে গিয়েছেন বিশ্বখ্যাতির দরজায়ও। তাঁকে কি আর দিতে পারি একবার দাঁড়িয়ে লাল স্যালুট দেওয়া ছাড়া ! ইদানীং স্বাস্থ্যের কারণে তাঁকে কিছুটা ঋজু মনে হলেও আপাত দৃষ্টিতে তিনি ঋজু নন মোটেও। মস্তিষ্ক তাঁর পূর্ণ সচল। এখনও দীপ্ত পায়ে হাঁটেন তিনি তীব্র মনোবল নিয়ে। তাই তাঁর জীবন খাতার পাতায় হেরে যাওয়ার ইতিহাস নেই বললেই চলে। এতো দৃঢ়তার ভেতরেও দেখা যায় এই সাহসি এবং কঠিন মানুষটির একটি কোমল মনও আছে হাসলেই ছড়িয়ে পড়ে যাঁর সারল্যের দ্যুতি। অথচ অত্যন্ত দৃঢ়তা রয়েছে ভেতরে যা তাঁকে সফলতার পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে সারাজীবন। তিনি এই সফলতার পেছনের মানুষ হিসেবে যাঁকে দাঁড় করিয়েছেন তিনি হচ্ছেন তাঁর স্নেহময়ী মা। মা'ই তাঁর প্রেরণাদাত্রী। মায়ের আশির্বাদের প্রতি কৃতজ্ঞার যেন শেষ নেই। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপের দৃঢ়তা দেখেই তা টের পাওয়া যায়। তিনি শতায়ু হোন। তাঁর মতো শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বকে শতায়ু হতে বলা গৌরবের। তিনি আরো সুদীর্ঘকাল বেঁচে থেকে জাতিকে আরো কিছু যেন দিয়ে যেতে পারেন এটা আমাদের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা।

আমরা মনে করি চট্টলচিত্রে প্রকাশিত তাঁর দীর্ঘ সাক্ষাৎকারটি সময়ের এক অনন্য দলিল। তাই এই মূল্যবান সাক্ষাৎকারটি গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করা হলো।

শরীফা বুলবুল

কালজয়ী পুরুষ

জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম

উপমহাদেশের মানবদরদী কৃতী চিকিৎসক জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় জীবনে এক অসামান্য অধ্যায়। তিনি দীর্ঘ ২৪ বছর একনাগারে পিজি'র ডাইরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে সফলতার সজীব ফসল তুলে যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন আর কারো জীবনে তা হওয়ার কথা নয়। এছাড়াও তৃতীয় বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী জাতীয় ঔষধ নীতি, ধুমপান বিরোধী আন্দোলন 'আধূনিক' এর অন্যতম প্রবক্তা হিসেবে বিশ্বব্যাপী তিনি নন্দিত হয়েছেন। এই জনগণ নন্দিত ডা. নুরুল ইসলাম কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে ১৯৫১ সালে এমবিবিএস পাশ করেন এবং বিলাতের ওয়েলস ভার্সিটির টিডিডি'তে প্রথম স্থান অধিকার করার পাঁচ মাসের ব্যবধানে প্রথম পরীক্ষাতেই এমআরসিপি (এডিন) হয়েছিলেন ১৯৫৬ সালে। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তাঁর মেধাবী যাতায়াত জাতি মুগ্ধ নয়নে দেখেছে। লেখক-হিসেবেও তার পরিচিতি কম নয়। আন্তর্জাতিকমানের অনেক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর শতাধিক গবেষণা নিবন্ধ। বৃটিশ সাময়িকী তাঁকে অভিহিত করেছে আইপিজিএমআর-এর 'ফাউন্ডিং ফাদার' বলে। একাডেমী অব সায়েন্সের স্বর্ণপদক বিজয়ী এ চিকিৎসা বিজ্ঞানী ১৯৬৩ সালে প্রেসিডেন্ট পদক, '৮৫সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ স্বর্ণপদক, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক ১৯৯০ এবং ১৯৯২ এর স্মারক স্বর্ণপদক লাভ করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার সঙ্গে ভারতের গোল্ডেন গ্রাহক সেবা পদক মহাত্মা এম.কে গান্ধী অহিংস শান্তি পুরস্কার এবং বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মাননাসহ অসংখ্য দামী দামী পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশে প্রথম বেসরকারী চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় ইউএসটিসি'র মতো মহান স্বপ্নের স্বপ্নদ্রষ্টা। তাঁর পুত্রবৎ এ প্রতিষ্ঠান দেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারী চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়। নিঃসন্দেহে এটি পৃথিবীর সামনে বাঙালি জাতির গৌরব করার মতো অদ্বিতীয় সন্তানের অদ্বিতীয় সেরা প্রতিষ্ঠান। তাঁর আরো একটি বড়ো পরিচয় স্বাধীন বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা আমাদের জাতির জনকের একজন ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন তিনি। তাঁর জন্ম ১৯২৮ সালে ১ এপ্রিল চট্টগ্রামের চন্দনাইশ থানার মোহাম্মদপুর গ্রামে।

যে নামটির সাথে আমার বাল্যকাল থেকেই পরিচয় এবং যে নামটির শক্তি আমাকে

ভীষণরকম মুগ্ধ করেছিল সেটি হচ্ছে জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম। আমার মা তাঁর সুখ্যাতি আমাদের সামনে তুলে ধরতেন-বিশেষ করে পড়ার টেবিলে যখন আমাদেরকে অমনোযোগী দেখতেন। তখন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতো একটি শুভ্র এ্যাপ্রোন। যখন বড়ো হতে থাকি এ মানুষটি সম্পর্কে জানার আগ্রহ আরো বাড়তে থাকে। কিন্তু এতো বড়ো মহীরূহের কাছাকাছি যাওয়ার সাহস আমার কেনোজানি হয়ে উঠেনি কোনদিন। অথচ তিনি আমাদের কতো আপনজন! আমাদের গ্রামের বাড়ী যাওয়ার পথের পাশেই ডা. ইসলাম স্যারের বাড়ীটি-যেটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমি প্রতিবারই মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি। অদ্ভুত এক রহস্যময়তা ঐ বাড়িটিকে ঘিরে, যেখানে জন্ম নিয়েছেন জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম। অজানা এক দ্বীপ আবিস্কারের আনন্দে গর্বে বুক ভরে যায়। আমার চোখে ভেসে ওঠে সাদা অমল শুভ্রতা, আমি আলোড়িত হতে থাকি এই অসামান্য তীব্র সাহসী মানুষটির কথা ভেবে। যিনি আমার কৈশোরের অন্যতম মোহ। যে নামটির মোহে পড়ে আমি স্বপ্নের জাল বুনেছিলাম, আমি ডা. নুরুল ইসলামের মতো ডাক্তার হবো, কিন্তু আমার পথ অন্যদিকে বেঁকে গেছে। তারপরও এ নামের মোহ আমার কাটেনি। এ নামের শক্তি এতো প্রবল ! ছেলেবেলায় মনের মধ্যে গেঁথে যাওয়া নামটিকে আমি বুকের কোনটুকুতে রেখে দিয়েছি বিনম্র শ্রদ্ধায়। চট্টলচিত্রে তাঁকে সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যে একদিন টেলিফোনে তাঁর কাছে সাক্ষাৎকারের সময় চাইলাম। তিনি সানন্দে রাজি হলেন। গত ১১ এপ্রিল ২০০৩ তাঁর সাথে আমি ও 'চট্টলচিত্র'র প্রধান সম্পাদক জামাল উদ্দিন এর সাথে প্রথম সাক্ষাৎকার পর্বটি শুরু হয় ইউএসটিসিস্থ ভাইস চ্যান্সেলর এর কক্ষে। প্রায় ২/৩ ঘন্টা একনাগাড়ে সাক্ষাৎকার পর্ব চলে। এর পরদিন প্রায় ৩/৪ ঘন্টা। তারপর তিনি ঢাকা চলে যান। আমরা আবার ঢাকায় তাঁর ৬৩ সেন্ট্রাল রোডস্থ বাসভবন 'গুলমেহের'-এ প্রায় একটানা দু'দিন বৈঠকে মিলিত হই। এরপর আবারও ইউএসটিসিতে কয়েক ঘন্টা। এভাবে টুকরো টুকরো অন্তরঙ্গ কথোপকথন পর্বের মিলিত রূপ এ দীর্ঘ সাক্ষাৎকারটি...

শৈশব ও কৈশোর কাল

১৯২৮ সালের ১ এপ্রিল চট্টগ্রামের চন্দনাইশ থানার মোহাম্মদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু। ১৯৪৩ সালে গাছবাড়িয়া নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় হতে লেটারসহ ম্যাট্রিক পাস করেন এবং সরকারী বৃত্তি লাভ করেন। তারপর কলকাতা ইসলামীয়া কলেজ থেকে আই.এস.সি পাস করেন ১৯৪৫ সালে...

শরীফা বুলবুল : ১১ এপ্রিল ২০০৩ শুক্রবার রাত ৮টা। আমরা জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছি তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ইউএসটিসি ভবনের ভাইস চ্যান্সেলরের অফিস কক্ষে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবে ডা. নুরুল ইসলাম সাহেবকে সবাই জানেন এবং চেনেন। পি.জি হাসপাতালের

ডাইরেক্টর হিসেবে দুই যুগেরও বেশী সময় ধরে দায়িত্ব পালন ছাড়াও উক্ত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান সম্পর্কেও কম বেশী সবার জানা রয়েছে। তাঁর পেশাগত সাফল্যের ইতিহাসও আমরা সবাই জানি। তাই আমরা এই আলোচনাটি অন্যভাবে শুরু করতে চাই। তা হচ্ছে আমরা প্রথমেই জানতে চাই তাঁর ছেলেবেলার কথা, পরিবার-পরিজন, স্কুলের সঙ্গী-সাথী এসব বিষয়ে। অর্থাৎ আমরা আত্মজীবনীমূলক আলোচনা দিয়েই আলোচনা পর্ব শুরু করবো–
যেমন বাবা, মা, পরিবার, বাল্যকাল কিভাবে কোথায় অতিবাহিত করেছিলেন এবং ম্যাট্রিক পরীক্ষা পর্যন্ত সময়কাল সম্পর্কে।
স্যার আপনি আপনার মত করেই বলে যান...

ডা. নুরুল ইসলাম : গ্রামেই কেটেছে আমার শৈশব। ১৯২৮ সালের ১ এপ্রিল চট্টগ্রামে আমার জন্ম। গ্রামের নাম মোহাম্মদপুর। আব্বা-আম্মা ছিলেন গ্রামের বাসিন্দা। ৩ ভাই ৫ বোন -এর মধ্যে আমি সবার ছোট। বড় ভাই মোহাম্মদ আসহাব চাকরি নিয়ে শহরে থাকতেন। মেঝ ভাই ফরিদ ছিলেন একটু অন্যরকম। পড়াশুনায় খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না। আমার যখন চার বছর বয়স তখন আব্বা মারা যান। তার আগেই বড় ভাই এবং বোনদের বিয়ে হয়ে যায়। বাড়িতে মা, ভাবী, মেঝভাই আর আমি থাকতাম। বাড়ি বলতে একটা মাটির ঘর-প্রথমে ছন উপরে টিনের ছাউনি। সামনে ছোট্ট একটা দেউড়ি। তার একটু দুরে পুকুর। এর পশ্চিম এবং দক্ষিণ পাড়ে গোরস্থান, পশ্চিম পাড়ের উত্তর সীমানায় মসজিদ। বাড়ির দক্ষিণদিকে ধানক্ষেত। পূর্বদিকে কিছু দূরে কয়েকটি বাড়ি, উত্তরদিকে কয়েকটি বাড়ির পর ছোট বাঁশবন। পূর্ব-দক্ষিণে ছিল শ্মশান। যেটাকে গ্রামের লোকেরা বলত-চিতাখোলা। মাগরিবের সময় গ্রামের সকলে বাড়িতে কেরোসিনের বাতি জ্বালতো। বেড়ার ঘরে ফাঁকে ফাঁকে অনেক দূর থেকেও মিটিমিটি আলো দেখা যেতো। মাঝে মাঝে রাতের অন্ধকারে শ্মশানের হরিবোল শব্দ আর আলো দেখা যেতো। মাঝে মাঝে রাতের অন্ধকারে শ্মশানের হরিবোল শব্দ আর কাউকে নাহলেও অন্তত আমাকে আতংকিত করে তুলতো। এমন পরিবেশে রাতের অন্ধকারে কখনও আমি সাহসের পরিচয় দিতে পারিনি।
একা থাকা ছিল আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। সারাক্ষণ মায়ের পাশে থাকতাম। প্রাকৃতিক কারণে ঘরের বাইরে গেলে মাকে পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো।

আব্বা মারা যাওয়ার পর স্কুলে ভর্তি হই। বেড়ে যায় পড়াশুনার চাপ। মাঝে-মধ্যে রাত করে পড়াশুনা করতে হতো, তখন সকাল সকাল ঘুমুতে যাওয়া হয় না। পাশে একটা জায়নামাজে আমি না ঘুমানো পর্যন্ত মা বসে নামাজ-কালাম, দোয়া-দরুদ পড়তেন। আমি ইচ্ছে করে কখনও ঘুমাতে যেতাম না। মাঝে-মধ্যে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে দেখতে পেতাম হাতে বই, বালিশের উপর মুখ। মা বলতেন, 'এখন ঘুমিয়ে পড়। ভোরে উঠতে হবে। রাত কম হয়নি।' অন্ধকার রূপ ধারণকরার আগে থেকেই বিশাল নীরবতায় সামান্য রাতকে গভীর বলে মনে হত। তারপরও মায়ের কথায় কান দিতাম না। স্কুলের পড়া শেষ করতে হবে। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে বাতিটাকে কাছে টেনে আবার পড়তে শুরু করতাম। পড়তে পড়তে কখন যে ঘুমিয়ে পড়তাম জানি না। সকালবেলা ঘুম ভাঙলে দেখতাম বাতি, বালিশ, বিছানা, বই আর আমি সবই ঠিক ঠিক জায়গায় ফজরের নামাজের পর জায়নামাজে বসে তসবিহ হাতে মা বলতেন- ভোর হয়েছে, এবার উঠে পড়। নামাজ পড়তে হবে। মায়ের ডাকাডাকিতে উঠে পড়তাম। মাকে ছাড়া কোনও রাত কাটিয়েছি কিনা মনে পড়ে না। কোনও কারণে মাকে কিছুক্ষণের জন্য কোথাও যেতে হলে বড়ভাবী সে দায়িত্ব পালন করতেন।

ছোটবেলায় একবার আমার জ্বর হয়। এক সপ্তাহ ধরে জ্বর বাড়ছে তো কমে না। গ্রামের অর্ধ শিক্ষিত ডাক্তার বলল 'সন্নিপাত'। তখনকার দিনে ভয়াবহ ছিল এ জ্বরের পরিণতি। ক্লোরোমাইসেটিন আবিস্কার হয়নি সে সময়। বিভিন্ন জটিলতা নিয়ে কখনও হয় মৃত্যু, আবার কখনও অঙ্গ হানি। তাই এই রোগের কথা শুনে আমার মা শিউরে উঠলেন। জ্বরের মধ্যে আমি কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞান হারিয়েছিলাম। যখন জ্ঞান ফিরল তখন মাকে বলতে শুনলাম– "আল্লাহ ! জীবের বদলে জীব দেব, জানের বদলে জান। তুমি আমার ছেলেকে বাঁচাও। তার অসুখটা আমাকে দাও"। মা বারবার এই কথা বলতে লাগলেন। পরদিন এক তাজ্জব ব্যাপার। মা পড়ে গেলেন বিছানায় আর আমার জ্বর কমতে শুরু করল। মা অসুস্থ হয়ে পড়ল আর আমি সুস্থ হয়ে গেলাম। এই ঘটনা হয়ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনেকে পরিহাস করবে। আমি বলব এটা আমার অভিজ্ঞতা। বৈজ্ঞানিক কোনও বিশ্লেষণ নয়। যাক সে কথা।

আমি ম্যাট্রিক পর্যন্ত গ্রামের স্কুলে পড়াশোনা করেছি। আমাদের বাড়ি থেকে প্রাইমারি স্কুল ছিল আধ মাইল দূরে। তিনজন শিক্ষক ছিলেন তখন। প্রধান শিক্ষক ছিলেন লম্বা-পাতলা, ফর্সা, হাসিখুশি। তাঁর স্নেহমাখা সম্ভাষণ এখনও মনে পড়ে। কোনও দিন

কাউকে তিরস্কার করতে দেখিনি। ওই পরিবেশ এবং শিক্ষক সব কিছুই আমার ভাল লাগত। তবুও সে স্কুল আমাকে ছেড়ে দিতে হল। মুরুব্বিরা বলল, পাশের গ্রামের এলাহাবাদ স্কুলে ভর্তি হতে হবে। প্রতি বছর ছেলেরা ওখান থেকে বৃত্তি পায়। ওখানকার পড়াশুনার মান উঁচু। আমাকেও বৃত্তি পরীক্ষা দিতে হবে। তাই ভর্তি হতে হল সেখানে। বড় ভাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক রঘুনাথ পন্ডিতের বাড়িতে প্রাইভেট পড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। আমি ছাড়া আরও দু'তিন জন সেখানে পড়াশোনা করত। এদের মধ্যে একজন বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত চর্ম ও যৌনরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. আবদুল ওয়াদুদ। মাস্টার মশাইয়ের আদর-যত্ন, স্নেহ, ভালবাসা কোনদিন ভুলতে পারব না। আমরা ছিলাম তার আপন সন্তানের মত। এমন একজন শিক্ষকের সান্নিধ্য জীবনের গতিপথে কতটুকু প্রভাব ফেলতে পারে; এর প্রমাণ বন্ধু আবদুল ওয়াদুদ। অশিক্ষিত পরিবারে তার জন্ম। তার বাবা ফজলুল রহমান সবাইকে লেখাপড়া করার জন্য উৎসাহিত করতেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল ওয়াদুদ লেখাপড়া করে বড় হোক। কিন্তু স্কুল ফাঁকি দেওয়া ছিল ওয়াদুদের স্বভাব। এখানে-সেখানে লুকিয়ে থাকত মাঝে মধ্যে। স্নেহশীল শিক্ষক তো কিছুতেই রেহাই দেবেন না। খাল-বিল, ঝোপ-ঝাড় যেখান সে লুকিয়ে থাকুক ধরে নিয়ে আসবেই। বেদম প্রহারও করেছেন কখনও কখনও। রঘুনাথ স্যারকে ভয় পেতো না; এমন ছেলে ছিল না। স্যার আসার সময় হলেই হৈ হুল্লোড় থেমে যেত। একদিন নুরুল হুদা চৌধুরী প্রশ্নের জবাব দিতে না পারায় অনেকক্ষণ ধরে একনাগাড়ে পিটুনি। সে অবস্থা দেখে পাশের হাফপ্যান্ট পরা এক ছেলে পেশাব করে কাপড় আর মেঝে ভিজিয়ে ফেলেছিল।

দেখতে দেখতে বৃত্তি পরীক্ষার সময় এসে গেল। স্কুল থেকে আমি ও ওয়াদুদ পরীক্ষা দিলাম। সে সময় শহর থেকে স্কুল- ইন্সপেক্টর আসলেন। তাঁকে আপ্যায়ন করার জন্য ওয়াদুদ আর আমার পক্ষ থেকে কলা, ডাব ও মিষ্টি নিয়ে আত্মীয়স্বজনরা হাজির। আমার তরফ থেকে যাওয়া মেঝ ভাই থেকে গেলেন অপরিচিত। ফলে ইন্সপেক্টরের সঙ্গে তাদের পরিচয় হল কিন্তু মেঝ ভাই থেকে গেলেন অপরিচিত। শেষে দেখা গেল বৃত্তি আমার ভাগ্যে জুটেনি। বৃত্তি পেল ওয়াদুদ। তার বৃত্তি পাওয়ার পেছনে ইন্সপেক্টরকে খাওয়ানোর কতটা প্রভাব ছিল বলতে পারব না। কিন্তু ফলাফল জেনে রঘুনাথ বাবু নিজেও অবাক হয়েছিলেন। মাস্টার বাবু বললেন আমার পরীক্ষা নাকি ভাল হয়েছিল।

এর দু'তিন দিন পর রঘুনাথ বাবু আমার বড় ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে প্রস্তাব দিলেন আমি যেন দ্বিতীয় শ্রেণীতে আরও এক বছর থেকে দ্বিতীয়বার বৃত্তি পরীক্ষা দিই। সৎ উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রস্তাবটা বড়ভাই সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে বললেন- জীবনের একটি বছর বড় মূল্যবান। মেধা থাকলেই হলো। বৃত্তির মাপকাঠিতে সবসময় সবকিছুর বিচার হয় না। আমি বিশ্বাস করি ভবিষ্যতে সে সফলকাম হবেই' বড়ভাইয়ের সেদিনের সেই সিদ্ধান্ত কতটুকু সঠিক ছিল তা জীবনের পদে পদে উপলব্ধি করেছি। তারপর আমার আর ওয়াদুদের প্রাথমিক বিদ্যালয় ছেড়ে নিকটবর্তী গাছবাড়িয়া নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পালা। সে স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন গিরিজাশঙ্কর চৌধুরী। আমি আর ওয়াদুদ চেয়েছিলাম ডাবল প্রমোশন নিয়ে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হতে। হেড মাস্টার বাবু পরপর দু'জনের ইন্টারভিউ নিলেন। প্রথমে আমার পরে ওয়াদুদের। প্রথমে আমাকে ইংরেজিতে প্রশ্ন করলেন. 'হোয়াটস ইউর নেম ? বললাম, মাই নেম ইজ্ নুরুল ইসলাম। তারপর বললেন হোয়াটস ইউর ফাদারস নেম্ ? তখন বললাম, মাই ফাদারস নেম ইজ সৈয়দুর রহমান। এরপর ইংরেজিতে আরও প্রশ্ন করলেন। গিরিজাশঙ্কর বাবু ইংরেজিতে আমার জবাব শুনে সন্তুষ্ট হলেন। আমাকে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হতে অনুমিত দিলেন। কিন্তু আমার পরে যখন ওয়াদুদ ইন্টারভিউ দিয়ে বের হয়ে এলো তখন তার চেহারা কিছুটা বিষণ্ন। জানলাম, ইংরেজিতে সে জবাব দিতে পারেনি। তাই চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারল না সে। আমরা শ্রেণী কক্ষের দিক থেকে আলাদা হয়ে গেলাম। একই গ্রামের ছেলে, একই স্কুলে আসা যাওয়া। খেলা-ধুলাও একসঙ্গে। শুধু পড়াশুনা আলাদা। প্রথম থেকেই ইংরেজির প্রতি আমার টান ছিল। বাংলা খারাপ লাগত না তেমন। অঙ্কে একটু কাঁচা ছিলাম। অন্যান্য বিষয়েও ভাল ছিলাম। অঙ্কের মাস্টার ভবানীশঙ্কর বাবু আমাদের বাড়ির পাশে লজিং থাকতেন। তিনি নিজে এসে একদিন আগ্রহ দেখান আমাকে অঙ্ক শেখাবেন। তবে কোনও অর্থের বিনিময়ে নয়। কিছুদিন তাঁর কাছে পড়াশুনা করে অঙ্কে যে দুর্বলতা ছিল তা কাটিয়ে উঠি। ক্লাসে আমি অন্যদের চেয়ে বয়সে ছোট ছিলাম। পাতলা শরীর, তেমনি উচ্চতাও কম। হেডমাস্টার বাবু আদর করে ডাকতেন লিলিপুট। ক্লাস শেষে বন্ধুরাও ঠাট্টা করত। তখন ভীষণ লজ্জা পেতাম আমি।

স্কুল জীবনে শিক্ষকদের কাছ থেকে অনেক পিটুনি খেয়েছি। সংস্কৃতের শিক্ষক পণ্ডিত মশাই মাঝে-মাঝে বাংলা পড়াতেন। আপন মনে সংস্কৃত এবং বাংলার সংমিশ্রণে তাঁর বক্তব্য বলে যেতেন। ঘন ঘন বলতেন 'বুঝলেন নাকি'? একদিন বিকেলবেলা পণ্ডিত মশাইয়ের ক্লাস চলছিল। আমি আর হাজি পাড়ার নুরুল ইসলাম পাশাপাশি বসে আছি। হঠাৎ উঁচু বেঞ্চ থেকে আমার পেন্সিলটা নিচে পড়ে গেল। দুষ্টুমি করে সে নিতে চাইল, আমিও নিতে চাইলাম। দু'জনের মাথায় টোকা লাগল। আমাদের কাণ্ড দেখে রেগে গেলেন পণ্ডিত মশাই। কাছে এসে দু'জনের মাথায় হাত রেখে তিনি বললেন- এবার তিনি নারকেল ফাটাবেন। কমপক্ষে ছয়-সাতবার তিনি আমাদের মাথা টুকাটুকি

করলেন। বললেন-এবার হয়েছে ? আমরা চুপচাপ। তখন মাথা টনটন করছিল ব্যথায়। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম এমনটি আর করব না। অন্তত পণ্ডিত মশাইয়ের ক্লাসে। পিটুনি খাওয়া এখানেই শেষ নয়। তবে শেষ পিটুনি খেয়েছিলাম দুষ্টুমির জন্য নয়, হাসির জন্য। বাংলার শিক্ষক ফজলুর রহমান সাহেবের ক্লাস ছিল সেদিন। তিনি প্রায় সর্দিতে ভুগতেন। কিছুক্ষণ পরপর রুমালে নাক ঝাড়তেন। সেদিন নাক ঝাড়ার সময় বিচিত্র এক শব্দ করলেন। প্রথম সারিতে আমি হাসি আটকাতে পারলাম না। তখন স্যার আমার পিঠে বেত মারতে লাগলেন। আরও হাসি পেলো আমার। বেতের পর বেত খেলাম, কিন্তু হাসি থামল না। এমনি করতে করতে যখন শেষ ঘন্টা পড়ল তখন স্যার রেগে বেরিয়ে গেলেন।

গাছবাড়িয়া হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলাম ১৯৪৩ সালে। এর আগে কখনও শহর দেখিনি। ম্যাট্রিক পরীক্ষা শেষ হবার পরপরই শহর দেখার ইচ্ছা জাগল মনে। অনেকের কাছে অনেক গল্প শুনেছি সিনেমা নিয়ে। এই আশ্চর্য ব্যাপার নাকি ! বন্ধু ওয়াদুদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলাম। তখন কার মুখে যেন শুনেছিলাম সিনেমা প্যালেস হলে 'শাদী' চলছে। খুব নামকরা ছবি। একদিন বিকেলে বড় ভাবীর কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে আমি আর ওয়াদুদ ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী হিসেবে শহরের দিকে যাত্রা শুরু করলাম। চট্টগ্রাম রেল স্টেশনে পৌছলাম সন্ধ্যা সাতটায়। প্রথম চোখে পড়ল বিজলী বাতি। খুব অবাক হলাম। তখন শহরে যানবাহন বলতে একমাত্র ঘোড়ারগাড়ি ছিল। বাস, রিক্সা কিছুই ছিল না। যথাসময়ে সিনেমা দেখে আমরা রাত ১২ টায় হল থেকে বের হলাম। ঠিক করলাম রাতটা কোনও মতে কোথাও কাটিয়ে দিয়ে ভোরের ট্রেনে ফিরে যাব। কিন্তু হঠাৎ দেখা হল আমাদের স্কুলের এককালীন ছাত্র চাটগাঁ শহরের ভি.আই.পি হোস্টেলের কেরানি মোক্তার আহমদ সাহেবের সঙ্গে। তিনি আমাদের সঙ্গে করে হোস্টেলে নিয়ে গেলেন। খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম আমরা। ভোরে ঘুম থেকে উঠে দেখি ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। স্টেশনে গিয়ে দেখি ট্রেন ছেড়ে চলে গেছে। পরের ট্রেন দুপুর ১২টায়। চিন্তায় পড়ে গেলাম আমরা। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে। কাঞ্চন নগর লাইনে শেষ স্টেশন ছিল দোহাজারী। তারপর নদী। নদীতে সেতু ছিল না। নদীর ওপারে যোগাযোগ ব্যবস্থাও ভাল ছিল না। তখন

দোহাজারী পরিচিত ছিল মিলিটারী ঘাঁটি হিসেবে। ওখান থেকেই অস্ত্র ও খাবার সরবরাহ করা হত। সামরিক প্রয়োজনে সেখানে ব্যবস্থা করা হয়েছিল বিমান অবতরণের। সে সময় চট্টগ্রাম থেকে অস্ত্র ও সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বিশেষ ট্রেন যাতায়াত করত দোহাজারীতে সে ট্রেন সাধারণ যাত্রীদের জন্য না। আমরা ভাবলাম, সাহেবদের অনুরোধ জানালে দয়া করে যেতে দেবে। তখন পয়সাও লাগবে না। এই উদ্দেশ্যে আমরা প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকলাম। এক ইংরেজ সাহেবকে সামনে দিয়ে যেতে দেখে গুড মর্নিং বললাম। কটমট করে তাকিয়ে চলে গেলেন তিনি। দ্বিতীয় একজন সাহেব আসলে গুডমর্নিং জানিয়ে তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করলাম-ইজ দিস্ ট্রেন গোয়িং টু দোহাজারী ? তখন সাহেব জবাব দিলেন 'ওয়েট'। আমরা ভাবলাম সাহেব বুঝি দয়া করলেন। এর কিছুক্ষণ পর বন্ধুকধারী এক নেপালী পুলিশ এসে দাঁড়াল। তাকে জিজ্ঞেস করলাম সাহেব কোথায় ? সে আমাদের চুপ থাকতে নিষেধ করে বলল- তোমরা হয়ত কোনও অপরাধ করেছ। কোনও কথা বলবে না। সাহেবরা রাগ করবে, তোমাদের কষ্ট দেবে। আরও কিছুক্ষণ পর কয়েকজন মিলিটারি একটি জিপ নিয়ে এসে আমাদের তুলে নিল। আমরা তখন খুশিতে আত্মহারা। কেননা শহরে নতুন নতুন জায়গা দেখার এবং জিপে চড়া এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। একটা ছোটবাড়ির সামনে এসে জিপ থামল। বাইরে পুলিশ। দরজায় তালা লাগান। ঘরের দরজার তালা খুলে আমাদের ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। দেখলাম সেখানে এক ভদ্রলোক বসে আছেন। আমরা ঢুকতেই বাহির থেকে আবার তালা লাগিয়ে দিল। মিলিটারি কম্বল, বিছানা থাকলেও বালিশ নেই। আমি ওয়াদুদ আর ওই ভদ্রলোক ভিতরে। সেই ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন- তোমরা কি করেছ ? তাকে ট্রেনের ঘটনাটা খুলে বলতেই তিনি বললেন- তোমাদের সন্দেহ করে বন্দি করা হয়েছে। একটু পর এক লোক এসে কিছু খাব কিনা জানতে চাইলে ডাল ভাতের কথা বললাম। ডাল ভাত নিয়ে আসা হল। তখন ওয়াদুদ হতাশার সুরে বলল- তুমি তো ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে এসেছ, তোমার কোনও চিন্তা নেই। আর আমার পরীক্ষা আগামী বছর। এক একটা দিন কতইনা মূল্যবান। না জানি কতদিন এখানে থাকতে হবে। ওয়াদুদের কথা শুনে আমি বললাম- দুর্ভিক্ষের বছর; আর চালের যা দাম, মানুষ না খেয়ে মরছে পথে ঘাটে। বাড়িতে পেট ভরে খেতে পাই না। এখানে অন্তত পেট তো ভরবে। সুতরাং ভাবনা কি ! ওয়াদুদ আর কিছু বলল না। খেয়ে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। দুপুরে আমাদের তুলে আরেকটি জিপে করে একটি অফিসে নিয়ে আসা হল। দু'জনকে আলাদা টেবিলে বসান হল। বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করা হল। আমরাও ঠিকমত উত্তর দিলাম। সন্দেহমুক্ত হতে আমাদের ভি.আই.পি হোস্টেলে নিয়ে যাওয়া হল। মোক্তার সাহেবের কাছ থেকে যা যা জানার তা জেনে নিলেন তারা। তারপর বিকেলের ট্রেনে আমাদের গ্রামে পাঠিয়ে দিলেন।

শরীফা বুলবুল : ম্যাট্রিক পাশ করলেন, এবার গ্রাম ছেড়ে কোলকাতা শহরে গেলেন, কিভাবে গেলেন কোন কলেজে ভর্তি হলেন কোথায় ছিলেন-এ সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি ?

ডা. নুরুল ইসলাম : ম্যাট্রিক পাস করার পর কোথায় ভর্তি হব এ নিয়ে দেখা দিল মহা সমস্যা। বড় ভাই তখন কলকাতায় থাকেন। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সরকারি বৃত্তি পাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তাই কলেজে বেতন দিতে হত না। মেঝ ভাই বললেন, শহরে কারও বাসায় গৃহশিক্ষক থেকে পড়াশোনা করার চেষ্টা করতে। শুনে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। আগে কোনও দিন পরের বাড়িতে থাকিনি। এর কিছুদিন পর কলকাতা থেকে বড় ভাই চিঠিতে জানালেন, আমাকে কলকাতায় যেতে হবে। আর আমার পড়াশোনাও

সেখানে হবে। খুশি হয়ে প্রথম চাটগাঁ শহর; সেখানে থেকে ট্রেনে চাঁদপুর। চাঁদপুর থেকে প্রথম স্টিমারে চড়ে গোয়ালন্দ। সেখান থেকে শিয়ালদহ হয়ে কলকাতায় পৌছলাম। পরদিন ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি করালেন। বাসা থেকে কলেজটি খুব বেশি দূরে নয়। প্রতিদিন সওগাত অফিসের সামনে দিয়ে পায়ে হেঁটে কলেজে যেতাম। বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হয়েছিলাম আমি। প্রথমদিনের ক্লাস ছিল পদার্থ বিজ্ঞানের। সামনের বেঞ্চে বসার সাহস পাইনি। দ্বিতীয় সারির বেঞ্চে বসেছিলাম। পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক নারায়ণ বোস রোল কল করার সময় প্রথম ইয়েস স্যার বলার পর বুক ধুক ধুক করছিল আমার। অনেক ছেলেই এখানে উর্দুতে কথা বলে। কয়েক মাসের মধ্যে আমিও উর্দু শিখে নিয়েছিলাম। মনে পড়ে; রসায়ন নিয়ে একদিন মজার এক ঘটনা ঘটেছিল। ভ্যালেন্সি জিনিসটা কোনও মতেই আমার মাথায় আসে না। সায়েন্স পড়ছিলাম ভবিষ্যতে ডাক্তারি পড়ার আশায়। ইসলামিয়া কলেজে জীববিজ্ঞান না থাকলেও মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হবার পর বঙ্গবাসী কলেজে জীববিজ্ঞান পড়ার সুযোগ ছিল। ভ্যালেন্সির জ্বালায় সিদ্ধান্ত নিলাম সায়েন্স ছেড়ে আর্টস-এ চলে যাব। অধ্যক্ষ ফ্রেন্ড প্যারেরার সঙ্গে দেখা করলাম। বিভাগ পরিবর্তনের কথা বলতেই তিনি বললেন- অধ্যাপক নারায়ণ বোস এই ব্যাপারগুলো দেখেন। পরদিন নারায়ণ বোসের সঙ্গে দেখা করলাম। আমার কথা শুনে তিনি বললেন, এটা করা ঠিক হবে না। কোনও সমস্যা হলে তিনি তো আছেনই। তাছাড়া অন্য শিক্ষকদেরও সহযোগিতা করতে বলবেন। এর মাসখানেক পর রসায়নের মাসিক পরীক্ষা হল। বাধ্য হয়ে পরীক্ষা দিলাম। কয়েকদিন পর রসায়নের প্রভাষক গণিমত আলী সাহেব যখন সবার খাতা ফেরত দিচ্ছেন তাতে

চেম্বারে বসে বিদেশী জার্নালে চোখ বুলোচ্ছেন

ফলাফল লেখা ছিল। আমার খাতা দেওয়ার সময় তিনি বলে উঠলেন-টপ অফ্ দি ক্লাস। অর্থাৎ ক্লাসে আমি সবার উপরে।

শরীফা বুলবুল : এবার মেডিক্যাল প্রসঙ্গ : মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন, পড়ালেখা করলেন, পাস করলেন, এ অসম্ভবকে কিভাবে সম্ভব করলেন ? সে সময়কার স্মৃতি মনে পড়ে কি ?

ডা. নুরুল ইসলাম : ইসলামিয়া কলেজে আই .এস.সি পরীক্ষা শেষে গ্রামে চলে আসি। বড়ভাই তখন বাঁকুড়ায়। কলকাতায় মুরুব্বী বলতে ছিলেন মামা ইকবালুর রহমান। ছোটবেলা থেকেই ডাক্তারী পড়ার প্রতি ঝোঁক ছিল আমার। সমাজে এ পেশার লোকের কদর তখন বোঝাতো জাকজমকপূর্ণ অফিস, খাকি পোশাকের দারোয়ান, বিরাট এলাকাসমৃদ্ধ বসবাসের বড় দালান। আর এম.বি.বি.এস পাস করলেই সিভিল সার্জন হওয়া যাবে, বড় ডাক্তার হওয়া যাবে এমন ধারণা গ্রামের সহজ সরল মানুষ থেকে শুরু করে শহরের কিছু উচ্চ শিক্ষিত মানুষের মনেও বদ্ধমূল ছিল। গ্রামে আসার আগে মামাকে বলেছিলাম, সময় মত মেডিক্যাল কলেজ থেকে ভর্তির ফরম নিয়ে রাখতে। যতটা মনে পড়ে সে বছর ২৫ মে ছিল ফরম নেওয়ার শেষ তারিখ। সর্বনিম্ন যোগ্যতা প্রথম বিভাগে আই,এস সি পাস। জুনের প্রথম সপ্তাহে পরীক্ষার রেজাল্ট বের হল। আমি প্রথম বিভাগে পাস করলাম। বৃত্তির তালিকায়ও আমর নাম ছিল। একবুক আশা নিয়ে কলকাতা চলে এলাম মেডিক্যালে ভর্তি হতে। মামাকে ইন্টারভিউ কবে তা জিজ্ঞেস করতেই মামা যা জানালেন, তার সারমর্ম হলো- ২৫ মে ফরম নেওয়ার শেষ তারিখ ছিল। তখনও আমার ফল বের হয়নি। আর রেজাল্ট কি রকম হয় সেসব কথা ভেবে ফরম নিতে লোক পাঠায়নি। আমার রেজাল্টের পর যখন ফরম আনতে পাঠিয়েছে তখন সময় শেষ। তারপর দিন ভোরে উঠে মেডিক্যালে চলে আসি। কিন্তু ফরম পাওয়া গেল না। তখন আমার পৃথিবীটা যেন অন্ধকার, আর আমি দিশেহারা। বাঁকুড়ায় বড় ভাইয়ের কাছে চিঠি লিখে জানালাম; মামা আমার সর্বনাশ করেছেন। তিনি এমন করবেন জানলে আমি বাড়ি যেতাম না। তিনদিন পর চিঠির জবাব এল। বড়ভাই লিখেছেন আমি ভুল করছি, ভর্তির ব্যাপারে মামার আন্তরিকতার কোনও অভাব নেই। মামা আমার পরম হিতৈষী। মেডিক্যালে ভর্তি হতে না পারলে অর্থনীতিতে অনার্স

পড়া উচিত। এখানেও ভবিষ্যত আছে। তাছাড়া মেডিক্যালে ভর্তির ব্যাপারে আরও একটি উপায় আছে বলে বড় ভাই জানালেন। সরকার প্রতিবছর কয়েকজন ছাত্রকে নমিনেশন দেয়। বিভাগের মাধ্যমে দরখাস্ত করলে হয়ত নমিনেশন পাব। চিঠি পাওয়ার পর সেক্রেটারিয়েট গিয়ে কীভাবে দরখাস্ত করতে হয় তা জেনে আসলাম। কাগজপত্র তৈরি করে দুইদিন পর দাখিল করলাম নমিনেশনের জন্য। তখন আমার দিনগুলো কাটছিল প্রচন্ড অস্থিরতার মধ্যে। একদিন মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে সচিবের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করি, কিন্তু সেদিন দেখা হল না। পরদিন আবার গিয়ে অনেক চেষ্টার পর দেখা হল। তাকে বিনয়ের সঙ্গে ফরম না পাওয়ার ঘটনাটা খুলে বললাম। সচিব বিরক্তির সঙ্গে জবাব দিলেন- 'তুমি মনে কর তুমিই একমাত্র গরিব ও গ্রামের ছেলে, আর কেউ নেই ! তুমি জান এখানে যারা দরখাস্ত করেছে তারা বেশির ভাগই গরিব। তাদের আমি কত সাহায্য করি। কিন্তু তুমি তো ভুল করেছ। আমার কিছুই করার নেই। এখানে তোমার ভর্তি হওয়া যাবে না।' ভেবেছিলাম সচিবের কাছ থেকে সাহায্য সহানুভূতি পাব, অথচ সে আশায় গুঁড়ে বালি। তারপরও হতাশ হইনি। সেদিনই তেজগাঁ কৃষি কলেজ ঢাকায় ভর্তি ফরমের জন্য দরখাস্ত করি। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার দিকে তেমন ঝোঁক ছিল না আমার। তাই ভাবলাম কৃষিবিদ্যাই শেষ পর্যন্ত পড়তে হবে। দুইদিন পর সচিবের সঙ্গে দেখা করলাম আবার। এবার তিনি অনেকটা রেগেই বললেন, বারবার যেন তাকে বিরক্ত না করি। আমার দ্বারা মেডিক্যালে ভর্তি কোনওদিনই সম্ভব না। উপায়ান্তর না দেখে অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। তিনি ছিলেন বিদেশি ইংরেজ সাহেব। প্রাক্তন আই.এম.এস অফিসার। পরদিন অধ্যক্ষের অফিস রুমের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। একটু পর তিনি বের হলেন। বিশাল গড়নের এক সাহেব। পরনে হাফ প্যান্ট, গম্ভীর স্বভাব। গুড মর্নিং বলতেই প্রতি উত্তরে তিনি গুড মর্নিং জানিয়ে বললেন- তোমার সমস্যা কি ? বললাম, আমি কিছু বলার জন্য দেখা করতে এসেছি। আমার কথা শুনে তিনি রুমে ঢুকে আমাকে ডেকে পাঠালেন। অধ্যক্ষের রুমে গিয়ে তাকে সব কিছু খুলে বললাম। তিনি আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পারদর্শীতার কথা জেনে নিয়ে সচিবকে ডেকে পাঠালেন। সচিবকে ডেকে ভর্তি ফরম দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন। সচিব হেডক্লার্ক থেকে ফরম নিয়ে আমাকে দিয়ে বললেন-'দেখলে তো তোমার সব ব্যবস্থা করে দিলাম। ঠিকমত ফরম পূরণ করে অফিসে জমা দাও মনে রেখো পাঁচদিন পর ইন্টারভিউ। তোমার এ কাপড়ে চলবে না। এগুলো ময়লা, পরিস্কার কাপড় পরে আসবে।' আমার পোশাকে হয়তো চাকচিক্য ছিল না। কিন্তু স্কুল জীবন থেকে কেউ আমাকে অপরিস্কার বলতে পারবে না। তবুও ঘন্টা দুয়েকের ব্যবধানে যা ঘটে গেল তা দেখে অবাক হলাম। একটু আগে যিনি আমাকে ভর্তির ব্যাপারে হতাশ করেছিলেন, অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছিলেন , তিনিই সেজে গেলেন আমার পরম হিতৈষী। এ স্মৃতি দুর্ভোগের নয়, এ স্মৃতি শেখবার।

শরীফা বুলবুল : আপনি এম.বি.বি এস ডাক্তার হলেন সেই ১৯৫০ সালে অর্থাৎ পাকিস্ত

ান নামক রাষ্ট্র জন্মের প্রথম দিকে, তখন পূর্ব পাকিস্তানে মুসলমান ডাক্তারের সংখ্যা হাতেগোনা কয়েকজন, আপনার চিকিৎসা জীবন কিভাবে শুরু হল, ডাক্তার হিসেবে

শিক্ষা জীবন

মাত্র ২৩ বছর বয়সে ১৯৫০ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস ডিগ্রি লাভ করেন জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম। ১৯৫৪ সালে লন্ডনের হুইটিংটন হাসপাতাল থেকে এফ.আর.সি.পি ডিগ্রী লাভ করে সাড়া জাগিয়েছিলেন তিনি, অর্থাৎ তখন তিনিই পূর্বপাকিস্তানের একমাত্র এফ.আর.সি.পি ডাক্তার। ১৯৫৫ সালে ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে টি ডি ডি ডিগ্রী পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে চিকিৎসা জগতে ঝড় তুলে ছিলেন। এছাড়াও এফ.সি.সি.পি (আমেরিকা), এফ.সি.পি.এস (পাকিস্তান), এফ.আর.সি.পি (এডিন), ও.এফ. এ. এস. ডিগ্রি লাভ করেন...

কোন মেডিক্যালে প্রথম যোগদান করলেন, কিভাবে করলেন, আপনার জীবনে প্রথম উল্লেখযোগ্য রোগী তথা কোন স্মরণীয় ঘটনা মনে পড়ে কি ?

ডা. নুরুল ইসলাম : ১৯৫০ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস পরীক্ষা দিই। কাগজে কলমে লেখা আছে ১৯৫১ সালের পাস করা ডাক্তার। তখন পাস করার পর ছয় মাস প্রশিক্ষণ নিতে হত। আর এখন সেটা বছরে পরিণত হয়েছে। সবার ধারণা ছিল; মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে লেগে থাকলে পাস করবেই। কেউ এপ্রিলে আবার কেউ নভেম্বরে। নভেম্বর ছিল ফেল করা ছাত্রদের। আমরা ছিলাম এপ্রিল ব্যাচের ছাত্র। তখন পূর্বপাকিস্তানে মুসলমান ডাক্তারের সংখ্যা কম ছিল। যে ক'জন হিন্দু ডাক্তার ছিল; তারাও পশ্চিমবঙ্গে চলে গেছে। একদিন খবর পেলাম ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে কয়েকটি পোস্ট খালি হয়েছে, গেলে পাওয়া যাবে।

প্রশিক্ষণ নেওয়ার সময় কলকাতা শিয়ালদহ স্টেশনে একটা ডিসপেনসারিতে বসতাম। তাতে কিছু আয় হত। ঠিক করলাম চাকরির সন্ধানে ঢাকা যাব। প্রথমবারের মত বিমানে করে ঢাকা আসি। সে এক নতুন অভিজ্ঞতা। এখনও মনে হলে কানে ভোঁ ভোঁ করে। দুইদিন পর সার্জন জেনারেলের কাছে ইন্টারভিউ। তিনি এডহক-এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবেন। হঠাৎ মেঝভাই ফরিদুল আলমের দেওয়া এক টেলিগ্রাম পেলাম। লেখা ছিল- মায়ের বাঁচার আশা নেই। মনে হল পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। রাতের ট্রেনেই রওয়ানা হলাম। সারারাত ট্রেনে ঘুমাইনি। আম্মার কি অবস্থা হবে ভেবে কাঁদছিলাম। পরদিন সকাল দশটায় গ্রামের বাড়িতে পৌছাই। ভাইবোন সব বাড়িতে। ডাক্তার ওয়াদুদ আমার বাল্যবন্ধু। ম্যাট্রিক পাস করার পর সে ভর্তি হয়েছিল চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজে এল.এম.এফ পড়তে। আর আমি কলকাতায়। ওয়াদুদ চার বছরে ডাক্তার। আর আমাকে আই.এস.সি এবং মেডিক্যাল দুটোতে কাটাতে হল সাত বছর। এল.এম.এফ ও এম.বি.বি এস এর তিন বছর ব্যবধান। তো ওয়াদুদ মাকে দেখছিল জানলাম।

ঢাকাস্থ ইউএসটিসি কার্যালয়ে জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম

আমি মায়ের পাশে বসলাম। মা তখন অজ্ঞান। চারদিকে সবাই দোয়া দরুদ পড়ছে। মাকে পরীক্ষা করে দেখলাম। মনে হল টাইফয়েড। তখন এর একমাত্র ওষুধ ছিল ক্লোরোমাইসেটিন। কে নাকি শহরে গেছে ওষুধ আনতে। ঘন্টাখানেক পর ওষুধ আসল। কিন্তু খাওয়াব কেমন করে ! রোগী অজ্ঞান। মুখ দিয়ে কিছু দেওয়াই যাচ্ছে না। কিছু গ্লুকোজ আর ভিটামিন ইঞ্জেকশন দেওয়া হচ্ছে পুষ্টির জন্য ক্লোরোমাইসেটিনের ইনজেকশন তখন পাওয়া যায় না। ভেবে কেনোও সিদ্ধান্তে আসতে পারছিলাম না। একবার ভাবলাম পায়খানার রাস্তা দিয়ে ডোজ হিসেবে দেব, পরে মনে হল তাতে কাজ হবে কি ? এমন করতে করতে হঠাৎ মাথায় আসল নাক দিয়ে পেটের ভিতর ঢুকিয়ে দিতে পারলেই হবে। যে টিউব নাক দিয়ে ঢুকানো হয় তার নাম রাইলস টিউব। দেরি না করে শহরে লোক্ পাঠান হল। চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে একটা আছে। বড়ভাই এ হাসপাতালের হেডক্লার্ক। তার মাধ্যমে বিশেষ অনুমতি নিয়ে রাইল্স টিউব ধার করে আনা হল। ক্যাপসুল ভেঙ্গে সামান্য দুধের সঙ্গে মিশিয়ে সিরিঞ্জে ভরলাম। টিউবের ভিতর ঢুকিয়ে দিলেই হবে। নাক দিয়ে টিউব ঢুকাবার চেষ্টা করতেই বোনেরা হৈ চৈ করে উঠল। সেটাই স্বাভাবিক । আমি সদ্য পাস করা ডাক্তার। কি বা আর জানি। দু'একজন জ্বালতে লাগল- মাকে শান্তিতে যেতে দাও। শেষটায় কষ্ট দিও না। আমি তখন ডাক্তার হিসেবে আমার সিদ্ধান্তে অনড়। কেউ কেউ বের হয়ে গেল ঘর থেকে। আর কেউ চোখ বড় করে তাকিয়ে দেখতে লাগল। ১৮ ইঞ্চি লম্বা রাইলস টিউব আস্তে আস্তে নাক দিয়ে ঢুকিয়ে দিলাম। ঢুকাবার সময় সবাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ছিল।

সমস্ত ঘটনায় ওয়াদুদ আমার পাশে বসে ছিল। টিউবের মাধ্যমেই ওষুধ দুধকলা সব খাওয়ান হচ্ছিল। প্রথম দুই দিন তেমন কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না। অনেকে প্রস্তাব দিল, গ্রামের প্রসিদ্ধ কবিরাজ সুরেন্দু সেনের ওষুধ ব্যবহার করতে। সেই প্রস্তাব একবাক্যে উড়িয়ে দিলাম। তৃতীয় দিন সকালে মা যখন চোখ খুলে আমার দিকে তাকালেন তখন বিরাট এক আত্মতৃপ্তি অনুভব করলাম। নরম গলায় তিনি জানতে চাইলেন- আমি কখন এসেছি। পরদিন জ্বর নেই দেখে টিউব বের করে নিলাম। মা দিন দিন সুস্থ হয়ে উঠল। মা জানালেন, কি হয়েছিল তিনি কিছুই জানেন না। ঘুম থেকে উঠে নাকে নল দেখে তিনি অবাক হয়েছিলেন। ডাক্তারী পাস করার পর পেশাগত জীবন শুরু করার আগে প্রথম রোগী হিসেবে চিকিৎসা করার সুযোগ পেয়েছিলাম আমার স্নেহময়ী মায়ের। সেই ঘটনাটি এখনও মনে পড়ে। আমি জানি না চিকিৎসা জীবনে এর চেয়ে সার্থকতা আর কি হতে পারে !

জামাল উদ্দিন : আপনি ডাক্তারী পাস করলেন। শুরু করলেন চিকিৎসা জীবন। কবে, কখন, কোথায় আপনি কর্মজীবনে যোগ দিলেন ?

ডা. নুরুল ইসলাম : ১৯৫১ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এম বি বি এস পাস করি। পরীক্ষা পাশের পর আমাদের ছ'মাসের বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ নিতে হয়। ঐ প্রশিক্ষণ প্রি রেজিষ্ট্রেশন ক্লিনিকেল এসিসটেন্ট (পি.আর.সি.এ) নামে পরিচিত ছিল। এটা শেষ করার পর রেজিষ্ট্রেশন পাওয়া যেত। অর্থাৎ পাস করার পর ডাক্তার হিসেবে স্বীকৃত হলাম। পাস করার পর সন্ধ্যাবেলা কিছু সময় শিয়াল দহের কাছে জনবহুল বস্তি এলাকায় একটা ডিসপেনসারিতে বসতাম। কখনো কখনো কিছু টাকা পয়সা হাতে আসত। এভাবে ছয়মাস কাটানোর পর ভাবনায় পড়লাম স্বদেশে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে গিয়ে চাকরী নেব নাকি কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাউজ ফিজিশিয়ান হিসেবে আরো প্রশিক্ষণ নেব।

খবর পেলাম ঢাকায় বেশ কিছু চাকরি খালি আছে। উৎসাহিত হয়ে ঢাকায় আসলাম। সার্জন জেনারেলের সাথে সরাসরি দেখা করলাম। তিনি আমাকে এডহক ভিত্তিতে এনাটমির ডেমনসট্রেটর হিসেবে চাকরীতে যোগদান করতে বললেন। আমি বললাম একবার এ বিভাগে গেলে আর রেহাই পাব না। আমাকে ওখানেই পঁচতে হবে। অথচ আমি হতে চাই চিকিৎসক, মেডিসিনে পারদর্শী। সার্জন জেনারেল সাহেব অতি সদয় ছিলেন। তিনি বললেন, বছর দুই পর নিশ্চয় তিনি আমাকে মেডিসিনে নিয়ে আসবেন। সবিনয়ে বললাম, আপনি যদি কোনো কারণে উক্তপদে অধিষ্ঠিত না থাকেন, তাহলে আমার আর উপায় থাকবে না। অর্থাৎ ভবিষ্যৎ এনাটমিতেই শেষ। আমার কথা শুনে তিনি বললেন, আমার সিদ্ধান্ত দু-একদিন পরে জানালেও হবে। পুনরায় কলকাতায় ফিরে যাই। এর আগে আমি কলকাতা মেডিকেল কলেজের বক্ষ বিভাগে নিযুক্তির জন্য দরখাস্ত পেশ করেছিলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম সুযোগ পেলে এখানে আমি ট্রেনিং নেব, ঢাকায় চাকরিতে যোগ দেব না। যথা সময়ে কলকাতা মেডিকেল কলেজের বক্ষ বিভাগে

হাউজ ফিজিশিয়ান হিসেবে নিযুক্তি পাই ভাতা হিসেবে তখন মাসে একশ বিশ টাকা দেয়া হত। তখনকার দিনে এ টাকা কম ছিল না। ট্রেনিং শেষে দেশে ফিরি ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে। কলকাতায় আমরা যে পাঁচজন প্রথম এম.বি.বি এস পাস করি,তারাই শুধু সেখানে থেকে গিয়েছিলাম। অন্যরা সবাই দেশবিভাগের পর ঢাকা মেডিকেল কলেজে চলে আসে। ঢাকায় এরা ছিল সবচেয়ে সিনিয়র। পাস করার পর এখানে বাধ্যতামূলক কোনো ট্রেনিং ছিল না। ডাক্তারিতে তখন প্রতি ছ'মাস পর পর পরীক্ষার প্রচলন ছিল। একবার ফেল করেও এরা আমাদের পেছনে পড়ল না। পাস করার পরপরই এরা ডাক্তার। আমরা যারা কোলকাতায় ছিলাম, আগে পাস করেও বাধ্যতামূলক ট্রেনিং পি.আর.সি'এ-র জন্য হয়ে গেলাম জুনিয়র। তাছাড়া আরো ছয়মাস বক্ষ ব্যাধিতে ট্রেনিং নিয়ে যখন আমি ঢাকায় আসি, এরা তখন সবাই 'এডহক' ভিত্তিতে নিযুক্ত চাকুরে। মায়নাও তখনকার তুলনায় নেহায়েত কম নয়, পোশাকে চালচলনে কেমনএকটা ভাব। নতুন চাকরি পেলে যা হয়। এডহক ভিত্তিতে নিযুক্তি পাবার আশায় সার্জন জেনারেলের সাথে পরদিন দেখা করার কথা। বাড়ি থেকে টেলিগ্রাম পেলাম মায়ের অসুখ। গ্রামে তার কাছে গেলাম। সার্জন জেনারেলের সাথে নির্ধারিত দিনে সাক্ষাত করা হলনা। মা সুস্থ হয়ে ওঠার পর আমি ঢাকা ফিরে আসি। খবর নিয়ে জানতে পারলাম এডহক ভিত্তিতে আর লোক নিয়োগ করা হবে না। যেহেতু পাবলিক সার্ভিস কমিশন দরখাস্ত আহবান করেছে। তারাই নির্বাচিত লোকদের নিয়োগ প্রদান করবে। যথাসময়ে দরখাস্ত পেশ করি। দেখতে দেখতে দু'মাস কেটে গেল। ইন্টারভিউর কোনো খবর নেই। একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে দিন গুনছিলাম। কোন ডিসপেনসারিতে বসে রোগী দেখার মনোবৃত্তি আমার ছিল না। বরং ভয় ছিল একবার যদি টাকাপয়সা রোজগারে জড়িয়ে পড়ি পড়াশোনা হয়তোবা আর সম্ভব হবে না।

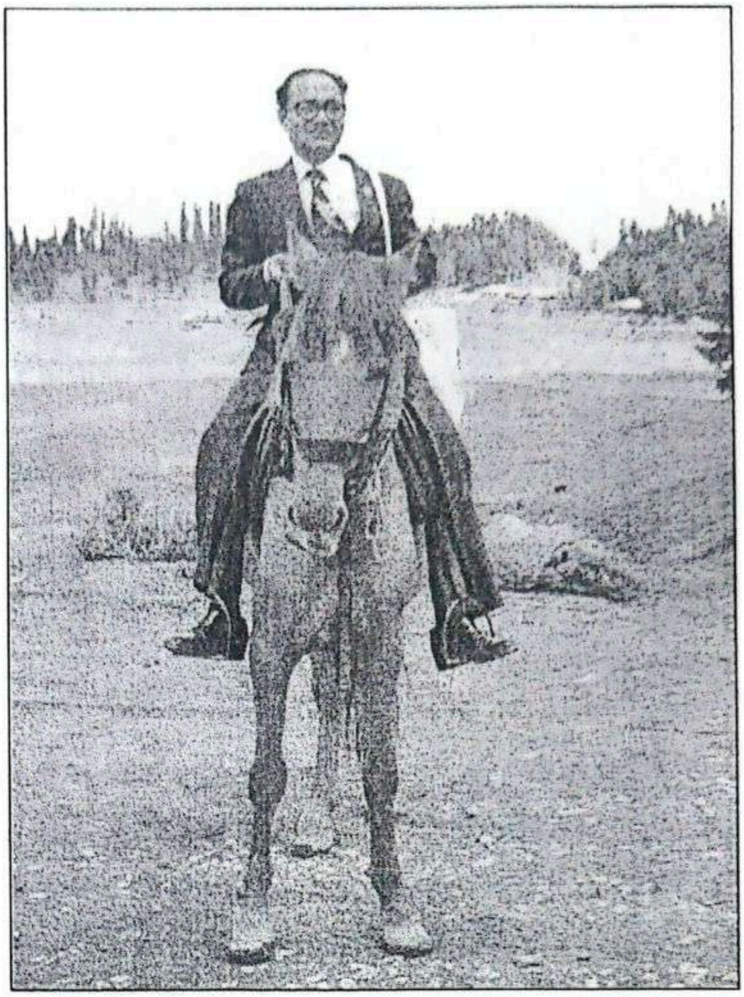

অশ্বারোহী ডা. নুরুল ইসলাম

কলকাতা মেডিকেল কলেজের পুরনো বন্ধুদের সাথে দেখা করতে মাঝে মাঝে

মেডিকেল কলেজ হোস্টেল ব্যারাকে যেতাম। এমন এক বিকেল বেলা গিয়ে দেখি চার-পাঁচজন কাপড়চোপড় পরে কোথাও যাবার জন্য তৈরী হচ্ছে। জানতে পারলাম কী একটা নতুন সিনেমা চলছে। দলের মুখপাত্র হিসেবে ডাক্তার নজির আহামদ আমাকে বলল, তুমিও চলো। তার এ প্রস্তাবে সম্মতি জানালাম। নজির বলল, আমরা নতুন সিস্টেমে সিনেমা দেখতে যাচ্ছি-একটুখানি অবাক হলাম। জানতে চাইলাম এটা আবার কী ? বলল 'বাইওট সিস্টেম'। এ সিস্টেমের কথা আমি আগে কোনদিন শুনিনি। ঐ দলের আরো একজন ছিল ডাক্তার সুলতান আহামদ। সে বলল বাইওট একটা ইংরেজী শব্দ। আশ্চর্য তুমি জানো না এর অর্থ হল Buy your own ticket । অর্থাৎ তোমার টিকেট তোমাকেই কিনতে হবে। এমন একটা পরিস্থিতি আমি মেনে নিতে পারিনি। নিজের অপারগতা জানিয়ে বিদায় নিলাম। তখন বারবার মনে হল সবই কপাল। কিন্তু কেন ? সকাল বেলা নামাজ পড়ে কোরআন তেলাওয়াত করার অভ্যাস আমার ছিল। তখন ট্রেনিং কলেজ রোডে মামা ইকবালুর রহমান সাহেবের বাসায় থাকতাম। সঙ্গে থাকতেন মামার দু'ভাই মুজিবুর রহমান চৌধুরী এবং আহমেদুল হক চৌধুরী, হতাশ হয়ে কিছুদিন থেকে নামাজ-কালাম বন্ধ করে দিলাম। মুজিব মামা জানতে চাইলেন হঠাৎ কেন নামাজ এবং কোরআন তেলাওয়াত বন্ধ করলাম।

আমি বললাম, এগুলোতে বিশ্বাস হারিয়েছি। আমি তো অপরাধ করিনি। মায়ের অসুখ শুনে গ্রামে গেলাম তার চিকিৎসা করতে। তা-না হলে পরদিন সার্জন জেনারেলের সাথে আমার যে ইন্টারভিউ ছিল তা হত। এডহক ভিত্তিতে চাকরী হত। আমার বন্ধুবান্ধব যারা নামাজ দোয়া পড়ে না এমনকি তাদের কেউ কেউ ধর্মেও বিশ্বাস করে না, তারাই এখন অনেক সুযোগের অধিকারী। তাহলে ধর্মে বিশ্বাস করে লাভ কী। সে কারণে এসব ছেড়ে এখন আমি নতুন পথে নেমেছি। শুনে মুজিব মামা ভয় দেখালেন বড় মামাকে বলে দেবেন।

একদিন সকালবেলা মামা এসে আমাকে শোয়া অবস্থায় দেখে রাগের সুরে বললেন, এত বেলা হয়েছে, এখনো তুমি শুয়ে আছ, নামাজ কালাম পড়না ? আমাকে নাজেহাল করার উদ্দেশ্যে মুজিব মামা সব বলে দিয়েছে। ধমক দিয়ে মামা বললেন, কোনদিন তুমি এমন কথা বলবে না। আল্লাহর রহমতের সীমা নেই। কখন কীভাবে আসবে বলা যায় না। রীতিমত নামাজ পড়বে কোরআন তেলাওয়াত করবে। সেদিন থেকে তার নির্দেশ মেনে

চলি। মাসখানেক পর পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ইন্টারভিউ হল।
একত্রিশটি শূন্যপদে নিয়োগপত্র দেয়া হবে, প্রথম চৌদ্দটি পদ স্থায়ী, বাকীগুলো অস্থায়ী। আরো একমাস পর একদিন সকাল বেলা ডাকযোগে চিঠি আসে। খুলে দেখি চাকরির নিয়োগপত্র। লেখা আছে, তালিকায় মেধানুসারে নাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আমার নাম একনাম্বারে। ভিক্টোরিয়া পার্কে মামার অফিস। নিয়োগপত্রটি হাতে নিয়ে সাথে সাথে তার অফিসে চলে যাই। আমাকে দেখে তিনি অবাক হলেন। নিয়োগপত্র তাঁর হাতে দিলাম। একটুখানি মুচকি হেসে বললেন, এখন কি বিশ্বাস হয় আল্লা আছে? আমি লজ্জা পেলাম। পরদিন সকালবেলা ঢাকা মেডিকেল কলেজে চাকরিতে যোগ দেই। ১৯৫২ সালের এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়। আমাকে বক্ষ বিভাগের আউটডোরে নিযুক্তি দেয়া হল। ইনডোর বলে তখন এ বিভাগের কিছুই ছিল না। এখানে নিযুক্তির কারণ ছিল দুটি। একটা আমার বিশেষ টেনিং অন্যটা চাকরিতে যোগ দেবার আগে বিদেশে টিডি.ডি পড়ার জন্য বৃত্তিলাভ। এ বিশেষ ডিগ্রিতে ভর্তি হতে হলে বক্ষ বিভাগে প্রশিক্ষণ নেয়া অপরিহার্য ছিল। ফলে টিডি.ডি কোর্সে ভর্তি হতে কোন অসুবিধা হয় নি।
জামাল উদ্দিন : আপনি উচ্চ শিক্ষা লাভে লন্ডন, আমেরিকা সহ পৃথিবীর অনেক দেশ সফর করেছেন, যে সময়ে বিদেশে পড়ালেখা করা দূরহ একটা ব্যাপার ছিল, যাতায়াত ব্যবস্থা, থাকা, খাওয়া ইত্যাদি নানা সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়েছে, আপনার পড়ালেখা তথা সে সময়কার কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলবেন কি?
ডা. নুরুল ইসলাম : এম আর সি পি কোর্স শুরু হবে ১ এপ্রিল (১৯৫৪) লন্ডনের হুইটিংটন হাসপাতালে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি সেক্রেটারী আবুল কাসেম সাহেব এ খবর আমাকে জানিয়ে বললেন লন্ডনে যাওয়ার জন্য তৈরি হতে। তিনি আমার জন্য টিকেট ও ব্যবস্থা করে রেখেছেন, সময়ের স্বল্পতার জন্য ইকনমি ক্লাশের টিকেট না পেয়ে বাধ্য হয়ে তিনি আমার জন্য কিনলেন প্রথম শ্রেণীর টিকেট। ঢাকা থেকে কলকাতা হয়ে লন্ডন যেতে হবে। এপ্রিল মাস, লন্ডনে তখন প্রচণ্ড শীত। ঢাকা থেকে কোট, প্যান্ট কিনলাম। বৃটিশ ওভারসিস এয়ারওয়েজ কর্পোরেশনের বিমানে করে যেতে হবে। সৌভাগ্যবশত একই বিমানে মিস পিনকারটন যাচ্ছিলেন কলকাতায়, যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের ডা. ডি. মার্কি ঢাকায় কর্মরত এ মহিলাকে আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন, প্রয়োজনে আমাকে সাহায্য করার জন্য তাকে অনুরোধ জানান, আমি তাতে অনেকটা আশ্বস্থ হলাম।
আমাদের বিমান কলকাতা পৌছল। মিস পিন্‌কারটন কলকাতা বিমান বন্দর থেকে আমাকে সোজা নিয়ে গেলেন বৃটিশ ওভারসিজ এয়ারওয়েজ কর্পোরেশন অফিসে। জানা গেল বৃটিশ বিমান সেদিন না গিয়ে পরদিন রওনা হবে।
ফলে আমাকে ২০ ঘন্টার মত কলকাতায় কাটাতে হবে। কিন্তু বিমান কর্তৃপক্ষ এ সময়ের জন্য কোন দায়িত্ব নেবে না জানিয়ে দিলেন। তাতে মিস্ পিন্‌কারটন জোর আপত্তি জানালেন। তিনি বললেন, যাত্রা বিলম্বের কারণে প্রথমশ্রেণীর যাত্রী হিসেবে

প্রথম শ্রেণীর হোটেলে আমার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা বিমান কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে। এটা আন্তর্জাতিক নিয়ম। বিমান কর্তৃপক্ষকে শেষ পর্যন্ত পিনকারটনের যুক্তি মেনে নিতে হলো। আমার থাকার জন্য হোটেলের ব্যবস্থা করা হল। কলকাতায় তখন উঁচুমানের হোটেল বলতে গ্রান্ড হোটেলের সুনাম ছিল। অভিজাত এলাকায় এ হোটেল। কলকাতায় ডাক্তারী পড়ার সময় এর নাম শুনেছি। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দূর থেকে দেখতাম। ভেতরে যাবার সুযোগ হয়নি। বিত্তশালী ও বিদেশীরাই এ হোটেলে থাকত। এমন একটা হোটেলে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে শুনে খুব খুশি হলাম। বিমান অফিস থেকে ট্যাক্সি যোগে পিনকারটন সহ হোটেলে আসি। তিনিও একই হোটেলে থাকবেন। হোটেল কর্মচারীরা আমাকেও পিনকারটনকে নিয়ে গেল পৃথক দুটো কামরায়। দুজনের কামরার মাঝখানে দুটো কামরার ব্যবধান। এমন বড় হোটেলে থাকার জীবনে এ আমার প্রথম সুযোগ। এমনি ভাবে সাজানো কামরা আগে কোনোদিন দেখিনি। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে হিসেবে কোন বড়লোকের বাসায় যাবার এবং এগুলো দেখার সুযোগও হয়নি। পিনকারটন আমার কাছে জানতে চাইলেন আমি কী খেতে চাই। এত উচু মানের খাবার সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। চালাকি করে বললাম 'আপনি যা খাবেন' আমিও তাই। আমি তাকে অনুসরণ করে খেতে শুরু করলাম। কাটা চামচের ব্যবহার। কাটা চামচ দিয়ে মাঝারি সাইজের একটি টমেটো মুখে দিতেই মুখ পুড়ে যাচ্ছে। কী অসহ্য অবস্থা। অনেক কষ্ট সহ্য করে গিলে ফেললাম। ততক্ষণে মুখের ভেতর পুড়ে গেছে। আর কিছু খেতে পারলাম না, ব্রেকফাস্ট শেষ করলাম। তিনি জানতে চাইলেন আমি খাচ্ছিনা কেন। জবাবে বললাম 'বেশি খেতে পারি না'। মুখের ভেতর পুড়ে যাবার কথা তাঁকে জানতেই দিইনি। পরদিন সকাল দশটা কি এগারোটা নাগাদ দমদম বিমান বন্দর ছেড়ে আমাদের প্লেন আকাশে উড়ে বৈরুত বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে। সন্ধ্যার পর বিমান অবতরণ করে। এখানেও একই অবস্থা। ফ্লাইট বারো ঘন্টা দেরী হবে। রাত কাটাতে হবে। আমাদেরকে হোটেলে নিয়ে যাওয়া হল। প্রথম শ্রেণীর হোটেলে আমাকে কক্ষ দেয়া হল। ওয়ারড্রোবে কাপড় রাখতে গিয়ে দেখি সেখানে চল্লিশ-পঞ্চাশটা বিভিন্ন রঙের টাই, মালিক নেই। হোটেল বয়কে জিজ্ঞেস করলাম এগুলো কার ? আগে যে ছিল ইচ্ছে করে ফেলে রেখে গেছে। হয়তোবা কোন প্রিন্সের হবে। সবগুলো নিলেও কিছু বলত না। সেদিকে মন যায়নি। একটু পরেই খাবার হোটেলে গেলাম, হোটেল মেইড এসে ইতিমধ্যে খাবার দিয়ে গেল। বিমানে আমার পাশের ভদ্রলোক আমার পাশেই বসলেন। ভদ্রলোক রেঙ্গুনের। বৌদ্ধধর্মালম্বী। আমার নাম ঠিকানা ধর্ম সম্বন্ধে তিনিও জানলেন, একটার পর একটা খাচ্ছিলাম। সামনের একটা প্লেট থেকে গোশ্তের টুকরো নেবার যেই হাত বাড়ালাম, ভদ্রলোক বললেন আপনি মুসলমান পর্ক কি খান ? এ শব্দটা আমার জানা ছিল না, জানতে চাইলাম এর নাম কী, তিনি বললেন 'হেম'। 'হেম' শব্দের অর্থ আমার জানা ছিল না। অর্থাৎ শুয়োরের গোশ্ত। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ প্রতিক্রিয়া শুরু হল। মনে হল তখনি বুঝি বমি হবে। এ ধরনের জিনিস এর আগে প্লেনে বসে খেয়েছি।

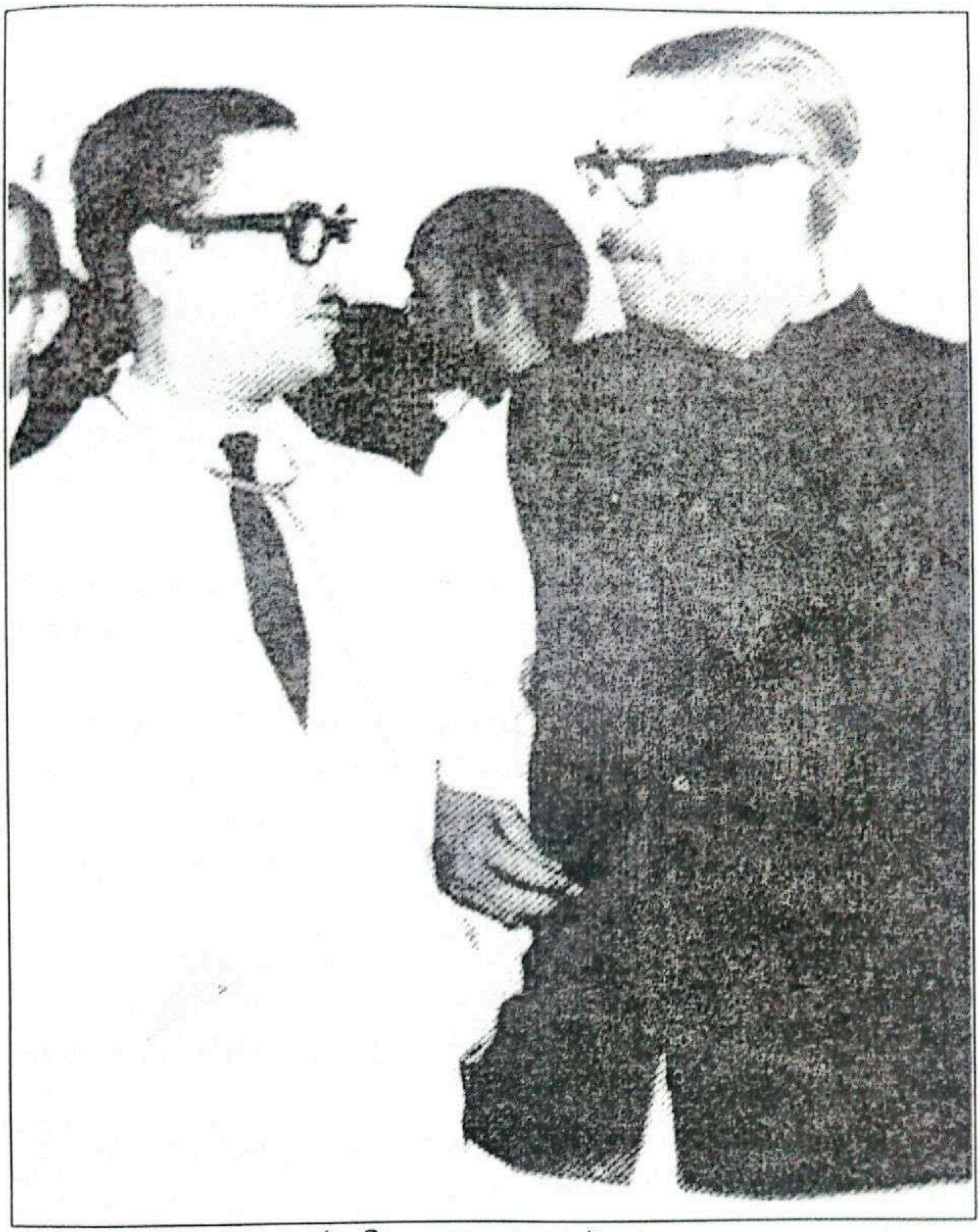

বঙ্গবন্ধুর সাথে এক অন্তরঙ্গ মুহূর্তে জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম

জানতাম না কিসের গোশ্‌ত।

এবার আর এক মজার ব্যাপার। বলা হল ঘন্টখানেকের মধ্যে হোটেলে সৌন্দর্য প্রতিযোগীতা আরম্ভ হবে। আমরা আমন্ত্রিত। কাগজে পড়েছি, কিন্তু কোনদিন দেখার সুযোগ হয়নি। যথাসময়ে আমাদের প্রদর্শণী-কক্ষে নিয়ে যাওয়া হল। সুন্দরীরা একের পর এক মঞ্চে এসে দেহ প্রদর্শন করে চলেছে। কিছুক্ষণ দেখার পর কেমন যেন লাগল। আমি উপভোগ না করে কামরায় চলে গেলাম। অভিজ্ঞতা হল। অবশেষে পরদিন লন্ডনে এসে পৌঁছি। সহযাত্রী বার্মিজ ভদ্রলোক আমাকে মাইগ্রেশন ফরমালিটিসএ সাহায্য

করে। অপেক্ষমান একটা টেক্সিওয়ালাকে ঠিকানা বললে সে আসন গ্রহণ করতে বলল। প্রায় আধঘন্টা পর আমার ঠিকানায় টেক্সি এসে থামে। ঠিকানা ১২ নং ব্রানজউইক স্কোয়ার। দরজায় স্যুটকেস রেখে বেল টিপলাম। একজন ভদ্র মহিলা বেরিয়ে এলেন, আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। বললাম, আমি পূর্ব পাকিস্তান থেকে এসেছি। জলিল সাহেব কোথায়? আমি তার ঠিকানা নিয়ে এখানে এসেছি। (ঢাকা মেডিকেল কলেজের চক্ষু বিভাগের ডাক্তার এম. এ জলিল এফ আর সি এস ডিগ্রী লাভের জন্য তখন লন্ডনে পড়াশোনা করছিল।) মহিলা বললেন তিনি সিনেমায় গেছেন। ফিরতে অনেক রাত হবে। আমি অসহায়ের মত তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। ভাবলাম প্রচণ্ডশীতে কী করি। আমি শীতে কাঁপছিলাম, আমার অবস্থা দেখে মহিলা আমাকে জলিল সাহেবের কামড়ায় নিয়ে গেলেন। এখানেও ঠান্ডা লাগছিল। মহিলা আমার অবস্থা দেখে পাশে আগুন জ্বেলে ঘর গরম করার ব্যবস্থা করলেন। তবুও মনে অস্থিরতা, জলিল সাহেব কখন আসবেন। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ কে যেন দরজায় নক্ করে। মহিলা দরজা খুলে মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোককে সাথে নিয়ে এসেছেন। বললেন ইনি মোঃ রফিক। পাশের কামরায় থাকেন। পূর্ব পাকিস্তান সার্ভে বিভাগে কাজ করেন, পাঞ্জাবের বাসিন্দা। আমার দেখাশোনার ভার রফিক সাহেবের ওপর দিয়ে মহিলা আবার চলে গেলেন। রফিক সাহেব, বললেন কিছুক্ষণ পর জলিল সাহেব আসবেন। এইমাত্র তিনি ফিরছেন। তিনি আমাকে তাঁর কামড়ায় নিয়ে গেলেন। বললেন আপনার নিশ্চয় ক্ষুধা পেয়েছে। যা আছে আশা করি দুজনের হবে। সামান্য কম হলেও চলবে। চিন্তা করবেন না, কোন অসুবিধা হবে না। জলিল সাহেব এলে কিছু একটা ব্যবস্থা করা হবে। ভাবছি রাতটা কিভাবে কাটানো যায়। হোটেলে থাকলে এক রাতে অনেক টাকা খরচ হবে। ডিম, ভুনা মাংস, পাউরুটি দিয়ে খাবার শেষ করলাম, খাওয়া শেষে দু'জনে আলাপ করছি-এমন সময় জলিল সাহেব এসে হাজির। আমাকে দেখে তিনি অবাক, ব্যাপারটা জানতে পেরে তিনি বললেন পরদিন হাইকমিশন অফিসে আমাকে যেতে হবে। তারা হয়তো সাহায্য করতে পারে বাসা ঠিক করে নিতে হবে।

এমন সময় গোটানো খাট, লেপ্ তোশক, বালিশ, চাদর সবকিছু নিয়ে মহিলা উপস্থিত। বললেন, বেচারা শীতে কষ্ট পাচ্ছে। সে প্রথম এদেশে এসেছে। তাকে দেখে আমার মায়া হল, তাই ভেতরে নিয়ে এসে তোমার কামড়ায় বসতে দিয়েছি। আজ রাতটা কোন রকমে কাটুক, কাল একটা ব্যবস্থা হবে, তারপর মহিলা বিদায় নিলেন। জলিল সাহেব বললেন 'এটা অস্বাভাবিক। এদেশে কামরা ভাগাভাগির রেওয়াজ নেই। আলাদা বিছানাপত্র দেওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না। অথচ তিনি সব ব্যবস্থাই করে দিলেন। তাতে আমিও অবাক হলাম। দীর্ঘ পথ বিমানেপাড়ি দেবার পর শরীর খুব ক্লান্ত। গভীর ঘুমে রাত কেটে গেল।

সকাল বেলা জলিল সাহেব নাশতা করার জন্য নিয়ে যান রাস্তার অপর পারে এক রেস্তোরায়। ডিম, রুটি, মাখন আর যা খাচ্ছিলাম। মাখন রুটি খাবার সময় মুখে শব্দ হচ্ছিল।

লন্ডন ক্লিনিকে বঙ্গবন্ধুর শয্যাপাশে ডা. নুরুল ইসলাম ,বেগম মুজিব, শেখ কামাল ও মহিউদ্দিন।

জলিল সাহেব সাবধান করে দিলেন। বললেন, খাবার সময় কোনো শব্দ করতে নেই। এদের কাছে এটা ভীষণ আপত্তিকর। তিনি শিখিয়ে দিলেন কিভাবে খেতে হয়। চা'তে যে টান দিলাম, তাতেও শব্দ হল। আবার নির্দেশ।

সকাল এগারটা নাগাদ নাইটস্ ব্রিজে পাকিস্তান মিশানে গেলাম। জলিল সাহেব এডুকেশন এটাচির সহকারীর সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন। দেখতে পেলাম তাঁদের চোখেমুখে বিরক্তির ভাব। থাকার জায়গা সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাদের বিজ্ঞাপন দেখার পরামর্শ দেন। বললেন, এ ব্যাপারে হাইকমিশন বা তাঁদের কিছুই করার নেই। হতাশ হইনি। আমাদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানীদের এ-ধরনের আচরণ তখনকার দিনে স্বাভাবিক ছিল। নিয়মানুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হাইকমিশনে দাখিল করে চলে আসি।

জলিল সাহেব ঐ দিনই আমাকে হুইটিংটন হাসপাতালের কাছাকাছি থাকার জায়গাটি করে দিলেন।

এখানে তিনজন পাঞ্জাবী ছাত্র থাকত। গৃহকর্ত্রী একজন মধ্যবয়সী প্রাক্তন নার্স। পেয়িং গেস্ট হিসেবে কামরা ঠিক করার পর এ তিনজন পশ্চিম পাকিস্তানী ছাত্রের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারা সব ভেটারিনারির ছাত্র। একজনের কাছে ভেটারিনারির (অনুবিজ্ঞান) উপর একটা বই দেখতে পেয়ে প্রশ্ন করে বসি ভেটারিনারিতে মাইক্রোবায়োলজি পড়ানো হয় নাকি ? অমনি একজন রেগে আগুন। বলল, তোমার

ডাক্তারীতে এ বিষয়ে যা পড়ে, তার চেয়েও অনেক বেশি পড়তে হয়। তুমি নির্বোধের মত প্রশ্ন করলে ? তার আচরণ দেখে অবাক হলাম। দুঃখ প্রকাশ করে নিজ কামরায় চলে এলাম। পরদিন সকালে হাত মুখ ধুয়ে সোজা নিচতলায় নাশতা করতে গেলাম। পরনে লুঙ্গী আর ড্রেসিং গাউন। গিয়ে দেখি পাঞ্জাবী ছাত্র তিনজন টেবিলজুড়ে চেয়ারে বসা। সকলেই স্যুট পরা। সোজাসুজি গিয়ে একপাশে বসলাম। একজন বলে উঠল ড্রেসিং গাউন পরে কামড়ার বাইরে যেতে নেই। আর তুমি এখানে খেতে এসেছ। এটা অভদ্রতা। চুপ করে শুনলাম। ঠিক সে মুহূর্তে গৃহকর্ত্রী আমার নাম ধরে ডেকে জানতে চাইলেন আমি কেমন আছি, বুঝতে না পেরে আমার স্বভাব সুলভ কায়দায় বললাম এ্যাঁ। গৃহকর্ত্রী বললেন 'এ্যাঁ' মনে কী। বলতে হয় মাফ করুন (পারডন)। পাঞ্জাবী বন্ধুদের একজন বলে উঠল 'তুমি একদম গেঁয়ো। রাগ সংবরণ করতে পারলাম না। বললাম আমি গেঁয়োই থাকব। এ্যাঁ বলব।

একদিন সকালে বসে নাশতা খাচ্ছি। গৃহকর্ত্রী এমন সময় এক মহিলার সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। নাম মিস লায়লা। প্রায় সমবয়সী, নাম শুনে আমি অবাক হলাম। বললাম-বেশ সুন্দর নাম তো ! এটা তো আমার দেশের নাম। গৃহকর্ত্রী বললেন তোমার পছন্দ হয় ? জবাবে বললাম নিশ্চয়। এমন সুন্দর নাম আর এমন একজন সুন্দরী কেন পছন্দ হবে না ? তিনি বললেন, তাকে নিয়ে সিনেমা দেখতে পারো। পার্কে বেড়াতে পারো।

একদিন গভীর রাতে সবাই ঘুমিয়ে আছে, আমি তখন একাকী আমার কামড়ায় পড়ালেখা করছি। সে সময় কে যেন দরজায় নক করল। খুলে দেখি সে লায়লা। বললাম এত রাতে ? সে বলল ভীষণ মাথাব্যাথা। কোনো ঔষধ আছে ? বললাম দুঃখিত, কোনো ঔষধ নেই। দুঃখিত সাহায্য করতে পারলাম না। মহিলা মাফ চেয়ে চলে গেল।

দুদিন পর প্রায় একই সময়ে দরজায় আবার ধাক্কা। খুলে দেখি আবার লায়লা। বলল ঘুমের কোনো ঔষধ আছে কি ? কিছুতেই ঘুম আসছে না। বললাম দুঃখিত, ঔষধ নেই। তবে দুটো ম্যাগাজিন বের করে তার হাতে দিলাম। এগুলো পড়তে পড়তে নিশ্চয় ঘুম এসে যাবে। তাকে বিদায় দিলাম শুভ রাত্রি। সকালে নাশতা করতে করতে ভাবতে লাগলাম লায়লার ব্যাপারটা কেমন যেন। যদি খপ্পড়ে পড়ি, তাহলে রেহাই নেই। মনের দুর্বলতা কখন বিপদ আনে জানি না। নাশতা শেষে জলিল সাহেবকে ফোন করলাম।

বললাম যেমন করেই হোক আমার জন্য একটা বাসা ঠিক করতে, এখানে থাকা সম্ভব নয়।
ভাগ্য আমার ভালোই। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে জলিল সাহেবের একই বাড়িতে একটা ছোট্ট কামরা পাওয়া গেল। গৃহকর্ত্রীকে বললাম আমাকে অন্য জায়গায় চলে যেতে হবে। শুনে তিনি বললেন কেন ? তোমার একা যদি ভালো না লাগে- দু-তিন দিন পর আরেকজন সুন্দরী স্বর্ণকেশী আসবে। তার সাথে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব। তোমার নিঃসঙ্গতা কেটে যাবে। আমি বললাম তা-নয়, নিতান্ত প্রয়োজনেই আমাকে চলে যেতে হচ্ছে। তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। আমার দেশের অতি প্রতিভাবান কত চেনা অচেনা ছেলে এই লাইলীদের খপ্পড়ে পড়ে জীবনে সর্বনাশ টেনে এনেছে তা দেখতে পেলাম।
পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রী লাভের পর দেশে চলে আসি। যোগদান করি ঢাকা মেডিকেল স্কুল ও মিটফোর্ড হাসপাতালে প্রভাষক রূপে। এম আর সি পি ডাক্তার আমিই এ পদে প্রথম। এর আগে এম বিবি এস পাস করা ডাক্তাররা এখানে প্রভাষকের পদে থাকতেন। সদ্য বিলাত ফেরত ডাক্তার হওয়ায় আমার তখন খোলা মাঠ। তৎকালীন সারা পূর্ব পাকিস্তানে আমিই একমাত্র এম.আর. সি.পি. টি.ডি.ডি- মনে পড়ে দেশে পৌঁছে পরের দিন সকালে যখন ঢাকা মেডিকেল কলেজে যাই তখন কলেজের বার্ষিক পূর্নমিলনী অনুষ্ঠান চলছিল। খবর পেয়ে অধ্যাপক কে এস আলম ও ডাক্তার কফিল উদ্দিন চৌধুরী আমাকে জোর করে মঞ্চে তুলে দিলেন। পরিচয় করিয়ে দেয়ার সাথে সাথে মুহুমুহু করতালি আর প্রাণঢালা অভ্যর্থনা। বিগত কয়েক বছরে উচ্চ শিক্ষার জন্য যে কয়েকজনকে পাঠানো হয়েছিল কোন না কোন কারণে কেউই কৃতকার্য হতে পারেনি। হুইটিংটন হাসপাতাল থেকে এম.আর.সি.পি শেষ করার পরে আমি যুক্তরাজ্যের সেন্ট জেইমস্ হাসপাতালে কোর্সে যোগদান করি। তারপর ব্রম্পটন চেস্ট হাসপাতালে এবং সপ্তাহে দু'দিন কুইনস্ স্কোয়ারে নিউরোলজি ইনস্টিটিউট প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। এভাবে মেডিসিন প্রশিক্ষণ পাবার পর ১৯৫৫ সালের জানুয়ারী মাসে ওয়েল্স বিশ্ববিদ্যালয়ে টি.ডি.ডি কোর্সে যথারীতি যোগদান করি। সে বছর জুন মাসে পরীক্ষা দিই। এ কোর্স ছিল ছ'মাসের। জানুয়ারী থেকে জুন। পরীক্ষার ফল বেরুলে জানতে পারি আমি প্রথম স্থান অধিকার করেছি। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিফ ছিলেন অত্যন্ত পিতৃসূলভ পরম হিতৈষী। আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, তোমার এম আর সি.পি করা ভালো হবে মনেকরি। এটা তুমি নিঃসন্দেহে করতে পারবে। বললাম আমার স্কলারশিপের মেয়াদ না বাড়ালে সম্ভব নয়। তৎকালীন
পাকিস্তানী হাইকমিশনারের কাছে এ ব্যাপারে তিনি অনুরোধ জানাবেন বলে আমাকে আশ্বাস দিলেন। বললেন তুমি দরখাস্ত করলে আমি ভালো করে সুপারিশ করব। তাঁর নির্দেশ মতো আমার স্কলারশিপের মেয়াদ বাড়িয়ে দিয়ে আমাকে এম আর সি পি করার সুযোগ দিতে আবেদন করলাম। স্কলারশিপের মেয়াদ ছয় মাস বাড়ানো হল। মনে কিন্তু

জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম এর সফলতার ফসল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম-ইউএসটিসি।

ভয় ছিল। এম আর সি পি পরীক্ষায় শতকরা দশ থেকে পনেরো জনের বেশি পাশ করে না। জীবনে কোন পরীক্ষায় ফেল করিনি। একবার যদি ফেল করি তাহলে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দেবার মতো ধৈর্য হয়তো আর থাকবে না। তখন এ লজ্জা আর মানসিক যন্ত্রণা কেমন করে সহ্য করব। এসব বিচিত্র ভাবনা মনে জাগতে লাগল। তবুও মনোবল নিয়ে পড়াশোনা পুরোদমে চালিয়ে যেতে লাগলাম। জানুয়ারী ১৯৫৬ সালে পরীক্ষা দেবার সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু কাউকেও জানতে দিলাম না। মায়ের দোয়া নিতেই পরীক্ষার সময় ও তারিখ দুটোই হিসেব করে মাকে জানিয়ে দিলাম। যথা সময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হল। বেশ কয়জন ভারতীয় এবং পাকিস্তানী ছাত্র এতে অংশ নিয়েছিল। শুক্রবার সকালে ঘুম থেকে উঠেই ফলাফলের খাম পেলাম। খুব ভয়ে ভয়ে খুললাম। পাস করেছি দেখে কান্না সংবরণ করতে পারিনি। খুশিতে দু-চোখে পানি এসে গেল। এ খুশির কান্না ছিল জীবনে আমার প্রথম। অর্থাৎ একমাত্র আমিই শুধু পাস করলাম তারপর বড়ভাই আসহাব আর বড়মামা ইকবালুর রহমানের কাছে টেলিগ্রাম পাঠালাম। টেলিগ্রাম পাঠানোর পর তাড়াতাড়ি পোস্ট অফিসে চলে গেলাম দেশে পঞ্চাশ পাউন্ড পাঠাতে হবে। মনে মনে নিয়ত করেছিলাম পাস করলেই এ টাকা আমার হাইস্কুল গাছবাড়িয়া এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের জোয়ারা হাইস্কুলে বিজ্ঞান বিভাগের যন্ত্রপাতি কেনার জন্য দেবো। তাড়াহুড়ো করে সেদিন পোষ্ট অফিসে গিয়েছিলাম এবং পঞ্চাশ পাউন্ড পাঠিয়ে মনে স্বস্তিবোধ করলাম।

জামাল উদ্দিন : তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে আপনিই তো প্রথম নাফিল্ড ফেলোশীপ ডিগ্রি লাভ করেছিলেন এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবেন কি ?

নুরুল ইসলাম : তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রথম নাফিল্ড ফেলোশীপ পাবার সুযোগ আমার হয়েছিল। তখন আমি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের মেডিসিনের অধ্যাপক। মাত্র কয়েকমাস আগে দাম্পত্যজীবন শুরু করি। মাকে দেশে রেখে

কিছুতেই যেতে মন চায় না। আমার স্ত্রী এবং আমি সিদ্ধান্ত নিলাম মাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। নাফিল্ড ফ্ল্যাটে একদিকে যেমন থাকার সুবিধে, অন্যদিকে মাসিক ভাতার পরিমাণও ছিল তিন-চারজনের জন্য যথেষ্ট।

১৯৬৩ সালের মার্চ মাসে মা ও স্ত্রীকে নিয়ে লন্ডন যাই। নাফিল্ড কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মতে ট্যাক্সি করে আমরা তিনজন উপস্থিত হই প্রিন্স এলবাট রোডের ১২ নং ফ্ল্যাটে। জনৈক মহিলা সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

শুভেচ্ছা বিনিময় ও পরিচয়পর্ব শেষে তিনি আমাদের তিনতলায় নিয়ে গেলেন। দু'কক্ষ বিশিষ্ট সেন্ট্রাল-হিটেড ফ্ল্যাট। সেদিন দুপুরবেলা একখানা চিঠি পেলাম। ব্রিগেডিয়ার হক্সিলির লেখা। তিনি ছিলেন নাফিল্ড ফাউন্ডেশনের পরিচালক। পরদিন তার সাথে দেখা করতে হবে। এদিকে সকালবেলা কেয়ারটেকার এসে বলে গেল মায়ের জন্য আলাদা খাট বিছানা দেয়া সম্ভব হবে না। কারণ নিয়মানুযায়ী এখানে তিনি থাকতে পারেন না। বিগ্রেডিয়ার সাহেবের সাথে পরদিন দেখা করি। তিনি আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে চা-বিস্কুট দিয়ে কথা শুরু করলেন। জানতে চাইলেন যাত্রাপথে কোথাও কোনো অসুবিধা হয়েছে কিনা। লন্ডনে কেমন লাগছে। ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম ভালোই। হঠাৎ তার চেহারার পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। তিনি গাম্ভীর্যের সুরে বলতে লাগলেন, শুনলাম আপনার মাকে নিয়ে এসেছেন। আমাদের আগেই জানানো উচিত ছিল। তাহলে অন্যকোথাও ব্যবস্থা করতাম। নাফিল্ড ফ্ল্যাটে স্ত্রী পুত্র ছাড়া অন্য কাউকেই রাখার নিয়ম নেই। সেজন্য তাঁকে এখানে রাখা যাবে না। আপনার ফেলোশিপ থেকে এ ফ্ল্যাটের যে ভাড়াটা কেটে রাখা হয়, তা দিয়ে বাইরে একটা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকতে পারেন। তাঁর কথায় সাথে সাথে রাজী হলাম। বললাম দু'এক দিনের মধ্যেই আমরা অন্য জায়গায় চলে যাব। আমি তাঁদের নিয়ম ভাঙতে চাই না। ফিরে এসে ঘটনাটি বলার সাথে সাথে আমার স্ত্রী বলল 'তুমি একটা বোকার মত কাজ করেছ। লন্ডনে উষ্ণ করা ফ্ল্যাট সে টাকায় কিছুতেই পাওয়া সম্ভব নয়। শহরের বাইরে হয়তো পেতে পারো। তাও উষ্ণ হবে কিনা সন্দেহ। তাছাড়া আসতে যেতে সময় লাগবে প্রচুর। ভাবনায় পড়ে গেলাম। বললাম চেষ্টা করে দেখিনা। রাগের সুরে স্ত্রী বলল দেখ গিয়ে। তিন-চারদিন ধরে দু-চারজন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে খোঁজ নিলাম। স্ত্রীর কথাই ঠিক হল। একে তো সে ধরনের ফ্ল্যাট নেই, যা পাওয়া যায় তা হয় বেশি দূরে না হয় বেশি দামী। আমার টাকায় হবে না। প্রোগ্রাম অনুযায়ী হাসপাতালে যাই, সময় পেলেই ফ্ল্যাটের খবর নিই। এভাবে প্রায় সপ্তাহ কেটে যায়। অবশেষে বিরক্ত হয়ে বললাম ফেলোশিপের দরকার নেই। দেশেই ফিরে যাব। মাকে ফেরত পাঠানোর প্রশ্নই ওঠে না। স্ত্রী বলল, এতে ঘাবড়ে যাবার কী আছে দেখি না। এটা ইংরেজী বেটাদের ইংরেজী কায়দা। তুমি শক্ত থেকো দেখবে তারা মেনে নিতে বাধ্য হবে। বিগ্রেডিয়ার হাক্সলির সাথে দেখা করে তুমি বলো নিয়ম অনুসারে আমাদের সাথে দুটো বাচ্চা রাখার অধিকার আছে। মাকে রাখতে পারব না কেন আমাদের তো ছেলেমেয়ে নেই। আরো তিন-চারদিন পর বিগ্রেডিয়ার হাক্সলির

সাথে দেখা করি। তিনি জানতে চাইলেন নতুন জায়গা ঠিক করেছি কিনা। বললাম থাকার মতো জায়গা খুঁজে পাওয়া গেল না। তার চেহারায় বিরক্তির ভাব। আমি বলতে শুরু করলাম, আপনাদের আইনে আমরা দুটো সন্তান রাখতে পারি। আমাদের তো সন্ত ান নেই, সে কারণে আপনাকে না জানিয়ে মাকে নিয়ে আসলাম। তাছাড়া আমাদের সামাজিক দৃষ্টিকোন থেকে আমরা যেভাবে হিসেব করি তা আপনাদের দেখতে হবে। বুড়ো বাপ-মাকে আমরা ঠেলে ফেলে দেইনা। ছেলেমেয়ের মতো কাছে রাখি। দেখাশোনা এবং আদর যত্ন করি। বুড়ো বয়সে তাঁদের আমরা ছেলেমেয়ে বলে গণ্য করি। যদি এ দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করা আপনার পক্ষে সম্ভব না হয় তাহলে বাধ্য হয়ে মাকে নিয়ে আমাকে দেশে ফিরে যেতে হবে। বললেন কী করা যায় তিনি দেখবেন। বাসায় ফিরে আমার স্ত্রীকে সব কাহিনী খুলে বললাম। সে বলল তারা রাজি হবেই। পর দিন চিঠি পেলাম হাক্সলির লেখা, আমি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি বিশেষ বিবেচনায় আপনি আপনার মাকে নিয়ে থাকতে পারবেন। আশাকরি ফেলোশিপ ব্যবহার করে দেশের কাজে লাগাবেন, ধন্যবাদ। চিঠিখানা হাতে নিয়ে আমার স্ত্রী বলল তুমি তো ঘাবড়ে গিয়েছিলে, আমি এদের চিনি। এরা শক্তের ভক্ত, প্রমাণ পেলে তো। উল্লেখ্য যে এ ফেলোশিপের মেয়াদকাল ছিল একবছর।

জামাল উদ্দিন : আমরা যতটুকু জানি পাকিস্তান আমলে বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরের শীর্ষে তথা প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানী তথা অবাঙালীরা। তারা বাঙালীদের ভালো চোখে দেখতেন না, বাঙালীদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, মেধা থাকলেও তা মূল্যায়ন করতেন না, নানা অজুহাতে চাপিয়ে রাখতো, আপনি এধরনের কোনো সমস্যায় পড়েছেন কি ?

ডা. নুরুল ইসলাম : মেডিসিনের শিক্ষক হিসেবে মিটফোর্ড হাসপাতালে আমাকে পোস্টিং দেয়া হয়। এম.আর সি.পি ডিগ্রীধারী শিক্ষক এখানে আমিই প্রথম। এখানে বেতন গ্রেড আলাদা ছিলনা, বরং এম.বি.বিএস ডাক্তারের সমপর্যায়ভুক্ত স্কেল ছিল। একদিন পত্রিকায় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বিজ্ঞাপন দেখলাম। সম্পূর্ন অস্থায়ী অর্থাৎ ছ'মাসের 'এডহক' ভিত্তিতে সহযোগী অধ্যাপক নেয়া হবে। ডা. মঈনুল হক আর আমি প্রার্থী ছিলাম। ডা. হক নিয়োগপত্র পেলেন। আমি বাদ পড়লাম। ডা. হক আমার একবছর আগে বিলেতে পড়তে চান। আমি যখন পাশ করে দেশে ফিরি দুর্ভাগ্য বশত তখনো তিনি পাশ করতে পারেন নি। ছয় মাস পর অবশ্য তিনি পাস করে দেশে ফেরেন।

কয়েকমাস পর জাতীয় পত্রিকাগুলোতে আবারো বিজ্ঞাপন বের হল। এবার সহযোগী অধ্যাপক পদে নিয়োগ করা হবে। তখন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন অবাঙালি। বাঙালিদের প্রতি তাঁর বিদ্বেষমূলক মনোভাব অনেকের জানা ছিল। এবারও আমি প্রার্থী হলাম। যথাসময়ে ইন্টারভিউতে হাজির হলাম। এবারও আমি নিযুক্তি পেলাম না। আমাকে ডিঙিয়ে ডা. রব পেলেন। কমিশনের বৈষম্যমূলক আচরণে আমি

ধৈর্য হারিয়ে ফেললাম। সিলেকশনের জন্য একটা শর্ত ছিল শিক্ষকতায় তিন বছরের অভিজ্ঞতা। তাও আমার ছিল। ডা. রবের অভিজ্ঞতা ছিল এক বছরেরও কম। আমি যখন বিলাত থেকে এম.আর সিপি ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরি তখন ডা.রব বিলাত যান, এবং আমার পরামর্শ নেন কি ভাবেপড়াশোনা করতে হবে।

চেম্বারে জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম

এমনকি পেশা জীবনের শুরুতেই তিনি তাঁর রোগী নিয়ে মাঝে মধ্যে আমার সাথে আলোচনা করতেন এবং পরামর্শ নিতেন। ইন্টারভিউ দেয়ার আগে সবাই ধারণা করেছিলেন আমিই নির্বাচিত হব। কিন্তু নির্বাচিত হলেন ডা.রব।

আমার বন্ধু ডা. সৈয়দ ইরশাদ আলীর শ্বশুর ছিলেন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। ইরশাদের স্ত্রী ছিলেন আমার হিতৈষী। রেগে তিনি তার বাবাকে আমার সামনে বললেন তুমি যদি এমন অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে না পারো, তাহলে ইস্তফা দাও। আমি জানি একা কিছু করা তার বাবার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমি হাল ছাড়িনি। অবাঙালি চেয়ারম্যানের সময়ে বাঙালিদের প্রতি কী কী অবিচার করা হয় তার একটা তালিকা প্রস্তুত করলাম। এতে তুলে ধরলাম। একটা বিজ্ঞাপিত পদে একজন প্রার্থী যদি থাকেন আর তিনি যদি বাঙালি হন, তাহলে তাঁকে অনুপযোগী বলে ঘোষণা করা হয়। যেখানে একটা পদ, একাধিক বাঙালী এবং একজন অবাঙালি প্রার্থী, সেখানে যোগ্য বাঙালি প্রার্থী বাদ দিয়ে অযোগ্য অবাঙালি প্রার্থীকে চাকরী দেয়া হয়েছে। যেখানে একটা পদের জন্য একজন প্রার্থী এবং সে প্রার্থী অবাঙালি হন, তাঁকে সে পদের জন্য উপযুক্ত বলা হয়েছে। একদিন সন্ধ্যাবেলা তালিকা নিয়ে তৎকালীন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী বিচারপতি ইব্রাহীম সাহেবের সাথে তার পুরানা পল্টনের বাসায় দেখা করি। সব কাহিনী শোনার পর তিনি বললেন, রাতেই গভর্নর আজম খানের সাথে তার দেখা হবে। সেখানে তাঁর নৈশভোজের দাওয়াত আছে। তখন তিনি বৈষম্যমূলক তালিকা তার হাতে দেবেন। এবং তদন্ত করে দেখার অনুরোধ করবেন। বাসায় গিয়ে আরো দু'একজনের কাছ থেকে খবর নিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরী করি। এক কপি ডা.খালেক সাহেবের হাতে দিলাম। তিনিও ইতিমধ্যে এহেন পক্ষপাতিত্বের শিকার হয়েছেন। ডা. মোজাফ্ফর আহমদ ছিলেন একজন অবাঙালি। খালেক সাহেবকে ডিঙিয়ে তাঁকে প্রমোশন দেয়া হয়েছে। বিচারপতি ইব্রাহিম সাহেবের

চিকিৎসক বাবার সাথে চিকিৎসক মেয়ে নীনা

সাথে দেখা করে তিনি তালিকা দেবেন এবং সব কথা বলবেন, ঠিক হল। ঘন্টা খানেক পর খালেক সাহেব কাগজখানা আমার কাছে ফেরত পাঠালেন। ফোনে বললেন ডা.নুরুল হুদা নামের একজন অবাঙালি সহকারী অধ্যাপক বিচারপতি ইব্রাহীম সাহেবের সাথে আলাপরত অবস্থায় আছেন জানতে পেরে ভয়ে তিনি চলে এসেছেন। আমি তখন ২১১ মিটফোর্ড রোডে আমার চেম্বারে রোগী দেখার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। ভাবলাম কী করি। অবশেষে বিশেষজ্ঞ ডা. টি এইচ খানের সাথে যোগাযোগ করে কাগজখানা তাঁর হাতে দিই। অনেকদিন থেকে অধ্যাপকের পদ খালি থাকা সত্ত্বেও এ পদে তাঁকে প্রমোশন দেয়া হয়নি। সবকিছু বুঝিয়ে দিলে তিনি খুশি হয়ে বিচারপতি ইব্রাহীম সাহেবের সাথে দেখা করে কাগজখানা তাঁর হাতে নিয়ে গেলেন।

পরদিন সকাল ন'টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রফেসর ও অন্যান্য শিক্ষকদের জরুরী মিটিং ডাকা হল। বলা হল স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং স্বাস্থ্য বিভাগে পরিচালক দুইজনই সভায় উপস্থিত থাকবেন।

বিষয়বস্তু কিছুই জানানো হয়নি। স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার গনি হায়দার বলতে শুরু করেন, আজকের জরুরী সভা এক বিশেষ কারণে। ডা. নুরুল ইসলাম মাননীয় গভর্নরের কাজে নালিশ করেছেন, বাঙালী-অবাঙালী প্রশ্ন তুলেছেন। বলেছেন বাঙালীদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে এবং হচ্ছে,এটা খুবই দুঃখজনক ব্যাপার এবং আমি তা গুরুতর অন্যায় মনেকরি। সঙ্গে সঙ্গে আমি বলে উঠলাম। দয়া করে ডা.নুরুল ইসলাম বলবেন না। তিনি বললেন কেন বলব না ? আমি বললাম অভিযোগ যারা করেছেন তাদের মধ্যে আমি সহ অনেকের স্বাক্ষর আছে। শুধু আমার নাম কেন বলবেন। আমি অনুবোধ করছি ডা. নুরুল ইসলাম এবং অন্যান্য ভুক্তভোগী ডাক্তার কথাটা ব্যবহার করতে। আমার কথামত ব্রিগেডিয়ার সাহেব তাঁর কথা শুধরে নিলেন। তারপর বললেন বাঙালী- অবাঙালী ভেদাভেদ করা হয়নি। কারো প্রতি কোনো অবিচার করা হয়নি। আমি আপত্তি জানিয়ে উদাহরণ তুলে ধরতে গেলে তিনি আমাকে পরদিন কাগজপত্র যা আছে হাতে নিয়ে তাঁর অফিসে দেখা করতে বললেন, জরুরী সভাটি এখানেই শেষ হল, অবাক হলাম আর একজন বাঙালিও বিশেষ করে ডাক্তার খালেক সাহেব আমার থেকে অনেক সিনিয়র হয়েও একটি কথাও বলেননি। আরো অনেকে ছিলেন, তাঁরা ও মুখ খুলেন নি।

পরদিন তাঁর অফিসে গেলাম। আমাকে প্রশ্ন করা হল কী হয়েছে, আমি বলতে শুরু করলাম। সব যোগ্যতা থাকা সত্বেও কেন আমি নিযুক্ত হলাম না। অনেক জুনিয়র হয়েও ডাক্তার রব নিযুক্তি পান কী করে। তিনি বললেন আপনি এম.আর.সি.পিএডিনবরা থেকে, রব এডিনবরা আর লন্ডনের। আমি বললাম তাই যদি হয় তাহলে প্রফেসর আসির উদ্দিন এফ আর সি এস-এডিনে আর ডা.এম.এন দত্ত লন্ডনের। এম.এন দত্তেরই প্রফেসর হওয়া উচিত ছিল। রাগে আর উত্তেজনায় বলে ফেললাম, আপনি শুধুমাত্র এম.বি.বি.এস। আলতাফ হোসেন এফ আর সি এস; এডিনবরা আর লন্ডন থেকে। তাকে নিয়ে এসে স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক কেন করা হল না ? ব্রিগেডিয়ারের চোখেমুখে অসন্তোষের ভাব। তিনি বললেন, আমি সব বুঝি আপনি এখন যেতে পারেন । দেখা যাক কী করা উচিত।

কয়েকমাস পর সহযোগী অধ্যাপকের আবারো একটি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হল। আমি দরখাস্ত পেশ করলাম। এবারও বাদ পড়লাম। ফলে ডা.রব এবং মঈনুল দু'জনই আমার সিনিয়র হয়ে গেলেন। ১৯৫৮ সাল। মিটফোর্ডে দু'বছরের বেশি কিছু সময় কাটানোর পর ঢাকা মেডিকেল কলেজে এডহক ভিত্তিতে আমাকে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্তি দেয়া হয়। মনে ক্ষোভ রয়ে গেল, আগে পাস করেও জুনিয়র হয়ে গেলাম। একদিন না একদিন এ অবস্থার অবসান ঘটাতে হবে।

১৯৬১ সালের শেষের দিকে 'প্রফেসর অব মেডিসিন' পদের জন্য জাতীয় পত্রিকায় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বিজ্ঞাপন বের হয়। বিদেশী জার্নালে ইতোমধ্যে আমার ডজন খানেক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বারী তখন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নব নিযুক্ত চেয়ারম্যান। নির্ধারিত সময়ে সিলেকশন কমিটির সামনে উপস্থিত হই। ডা. রব এবং মঈনুল হকও প্রার্থী ছিলেন, রবের প্রকাশিত প্রবন্ধ ছিল মাত্র দুটো। মঈনুল হকের তাও ছিল না। ইন্টারভিউ হয়ে গেল। পরে জানতে পারলাম প্রফেসর পদের জন্য আমার নাম সুপারিশ করা হয়েছে। কথাটি জানাজানি হয়ে গেল। অন্যায়ভাবে এতদিন সহযোগী অধ্যাপক পদে যিনি আমার সিনিয়র বিবেচিত হয়ে আসছিলেন তাঁকে ডিঙিয়ে আমি প্রফেসর হব, এটা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। তখন সহযোগী অধ্যাপক পদের জন্য আজকের মত সরাসরি প্রমোশন হত না।
ডা.রব বিষয়টি সহজে মেনে নিতে পারেনি। তিনি উঠেপড়ে লাগলেন। এমনকি গভর্ণর আজম খানের সাথে দেখাও করেছেন। রব সাহেবের চেষ্টা-তদবিরের ফলে আমার নিয়োগপত্র এক প্রকার স্থগিত রাখা হয়। আমিও কোথায় কি হচ্ছে তার খবর নিতে থাকলাম। এক পর্যায়ে স্বাস্থ্যসচিব ফজলুর রহমান সাহেবকে সব খুলে বলি। পরদিন তিনি আমাকে ফোন করে বললেন ব্যস্ত না থাকলে যত শীঘ্র সম্ভব তাঁর বাসায় যেতে। আমি তাঁর ধানমন্ডির বাসায় গিয়ে উপস্থিত হই। তিনি আমাকে একটা কাগজ হাতে দিয়ে বললেন, আমি যেন দেরি না করি। পড়ে দেখি এটা মেডিসিনের অধ্যাপক হিসেবে আমার নিয়োগপত্র। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে পোষ্টিং দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন যত দ্রুত সম্ভব জয়েন্ট করতে হবে। দেরি হলে হয়তোবা বাধার সৃষ্টি হতে পারে। জটিলতার সম্ভাবনা নিয়ে ভাবনায় পড়লাম। তখন বিকেল চারটা। সব অফিস আদালত বন্ধ। রাতের ট্রেনে চট্টগ্রাম গিয়ে পরদিন সকালে চট্টগ্রামে মেডিকেল কলেজে যোগ দিতে চাই; অনেক প্রচেষ্টার পর সকল কাজ সমাপ্ত করে রাতের ট্রেনে সকাল ৮টায় চট্টগ্রাম এসে পৌছি। বেলা ৯টায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের অফিসে এসে উপস্থিত হই। কলেজের তখন প্রশাসক ছিলেন একজন পাঞ্জাবী। তিনি আমাকে কাজে যোগ দেবার অনুমতি দিলেন। এভাবে প্রফেসর হিসেবে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে আমার

পিজিতে নিয়োগ

১৯৬৩ সালে পূর্ব পাকিস্তানে আই পি.জি.এম.আর (পিজি হাসপাতাল) প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন অন্যতম উদ্যোক্তা। প্রতিষ্ঠালগ্নেই তিনি ছিলেন পিজি হাসপাতালের যুগ্ম পরিচালক, পরের বছর অর্থাৎ ১৯৬৪ সালে পরিচালক হিসেবে হাল ধরেন ঐতিহাসিক সেই পি.জি হাসপাতালের। সেই থেকে একটানা ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত ২৪টি বছর তিনিই ছিলেন পি.জি'র পরিচালক। এই সৌভাগ্য আর কোনদিন কারও জীবনে আসবে না।

যোগদান পর্ব শেষ হয়। পাঁচ বছরের মতো সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেছি। ওখানে আমার অনেক ছাত্র।

জামাল উদ্দিন : জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশংসিত পি. জি হাসপাতাল। আপনি এই হাসপাতাল পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন প্রায় সিকি শতাব্দি। পি.জি'র ইতিহাসে আপনি এক স্মরণীয় অধ্যায়, যা আর কারো জীবনে আসবে বলে মনে হয় না। পি.জি তে নিযুক্তি তথা দীর্ঘ সময়ের কিছু পর্যালোচনা
করুন ?

ডা. নুরুল ইসলাম : ১৯৬৫ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে নানা বাধা-বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও আইপিজিএমআর প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর মোনায়েম খানের অবদান এখানে অনস্বীকার্য। পূর্ব পাকিস্তানে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু হোক, পাকিস্তানী শাসকরা তা কোনোদিন চাননি বরং বাধা দিয়েছেন। তাঁদের যুক্তি ছিল, পাকিস্তান শাসকরা তা কোনোদিন চাননি বরং বাধা দিয়েছেন। তাদের যুক্তি ছিল, পাকিস্তান একটি দেশ এবং সেখানে একটি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মহাবিদ্যালয়ই যথেষ্ট। মোনায়েম খাঁ তাতে ভিন্নমত পোষণ করেন। এখানে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানেরও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার ব্যবস্থা হোক এ-বিষয়ে তিনি ছিলেন অনড়। মুখ্য সচিব এস এস শফিউল আযমও ছিলেন একজন দক্ষ প্রশাসক। তাঁদের উভয়ের মতের মিল থাকায় ১৯৬৫ সালে এ শিক্ষাব্যবস্থা চালুর উদ্দেশ্যে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। এতে সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক মোহাম্মদ আসিরউদ্দীন, ফিজিওলজি বিভাগের অধ্যাপক আবদুর রহমান, রেডিওলজির অধ্যাপক শামছুল হক এবং আমি ছিলাম এ কমিটির সদস্য। এ কমিটির একটি প্রজেক্ট তৈরি করে অধ্যাপক আবদুর রহমানকে জয়েন্ট ডাইরেক্টর নিযুক্তির সুপারিশ করে গভর্ণরের কাছে প্রস্তাব পাঠালে তিনি সরাসরি আমাকে যুগ্ম পরিচালক নিযুক্ত করে অবিলম্বে কাজে যোগ দেয়ার নির্দেশ দেন। আমি

তখন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলাম। শুরুতে সামান্য দ্বিধাবোধ করলেও শফিউল আজমের পরামর্শ মোতাবেক ১৯৬৫ সালের ৬ই ডিসেম্বর আমি কাজে যোগ দেই।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে একটি ওয়ার্ড (১১ নম্বর),কয়েকটি কেবিন এবং দু-একটা ক্লাসরুম নিয়ে কিছু শিক্ষককে খণ্ডকালীন নিয়োগ দেয়া হল। সার্বক্ষণিক চিকিৎসক হিসেবে ছিলেন অধ্যাপক এ কে এম শামছুদ্দিন, নুরুল ইসলাম এবং স্যার ক্যামেরুন। মেডিকেল কলেজের পাশে কিছু খালি জায়গায় ৩টি টিনের শেড তৈরি করা হয়– একটি লাইব্রেরি, ২টি অফিস এবং ক্লাসরুম। প্রথম ব্যাচে ছাত্র ভর্তি করা হয় ১৯৬৫ সালে। কোর্স চালু হয় ১৯৬৬ সালে এবং ১৯৬৮ সালে প্রথম ব্যাচে পরীক্ষা দেয় ৩৬জন ছাত্রছাত্রী। এখান থেকেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষা এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয়।

সে-সময় ঢাকা শহরে নাম করা হোটেল ছিল মাত্র একটি। শাহবাগ এলাকায় অবস্থিত ছিল শাহবাগ হোটেল। ১৯৬৬-৬৭ সাল থেকেই এই হোটেলের অবক্ষয় হতে থাকে এবং ৭০এর দশকে এর নাজুক অবস্থার সৃষ্টি হয়। সরকার এই হোটেলের বিলুপ্তির কথা ভাবছিলেন। এসময় আমার অনুরোধে শফিউল আযম অধ্যাপক শামছুদ্দিন, কাজী শামছুল হক এবং আমাকে নিয়ে তিন-সদস্য একটি কমিটি গঠন করেন। এই হোটেলকে হাসপাতালে রূপান্তরিত করা যায় কিনা পরীক্ষা করে দেখা ছিল এই কমিটির দায়িত্ব। কমিটি স্বল্প সময়ের মধ্যে সুনির্দিষ্ট মত প্রকাশ করে বলেন, হোটেলকে হাসপাতালে রূপান্তরিত করার অনেক সুবিধা আছে। যেমন– রান্নাঘর, লন্ড্রি রুম, হলঘর ইত্যাদি সবই হাসপাতালের কাজে লাগবে। রুমগুলো কেবিনে রূপান্তরিত করা যাবে। ভিআইপি ব্লকটা বেসিক সাইন্সের জন্য উপযুক্ত হবে। সর্বোপরি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষা এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা একটি স্বতন্ত্র জায়গায় চালু করতে হলে নতুন ভবন তৈরির চেয়ে এই পরিত্যক্ত হোটেল ব্যবহার খুবই উপযুক্ত হবে।

শফিউল আযম একজন কর্মঠ, দক্ষ সচিব ছিলেন। তিনি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। ১৯৭১ সালের কোনো-এক সকাল বেলা শাহবাগ হোটেলে চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থানান্তর করার জন্য নোটিশ জারি করেন। এই নোটিশ পাওয়ার পর অতি উৎসাহের সাথে একই দিন সকালবেলা কয়েকটি রোগী এসে হোটেলে রেখে ঘোষণা দিলাম এটি আইপিজিএমআর-এ রূপান্তরিত হয়েছে। তিনি জানতেন মসজিদ এবং হাসপাতাল দুটো একবার প্রতিষ্ঠা হলে বিলুপ্ত হয় না, কেউ দখলও করে না।

১৯৬৮ সালে স্যার ক্যামেরুনের চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে তিনি এডিনবরা চলে যান এবং আমি পিজি'র ডাইরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পাই। তখন থেকে একনাগাড়ে পরিচালক এবং মেডিসিনের অধ্যাপক হিসেবে ১৯৬৭-৮৯ সাল পর্যন্ত কর্মরত থাকাকালীন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট চিকিৎসা শিক্ষাব্যবস্থা বিকাশে যে অপূর্ব সুযোগ পেয়েছি পরবর্তীকালে সে-সুযোগ আর কারো ভাগ্যে জুটবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

এসোসিয়েশন অব ফিজিসিয়ানস অব বাংলাদেশ এর সম্মেলন ও বৈজ্ঞানিক অধিবেশনে প্রফেসর ওয়ালিউল্লাহকে স্বর্নপদক দিচ্ছেন জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম

চাকুরি জীবনের শুরুতে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট চিকিৎসা শিক্ষা নিয়ে আমার জীবনযাত্রা শুরু। আমি আইপিজিএমআর-এ যোগ দেই ১০ই ডিসেম্বর ১৯৬৫ সালে। ৩ মাস পর অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি '৬৬ সালে এমফিল এবং এফসিপিএস কোর্স চালু করা হয়। একই সালে অর্থাৎ ১৯৬৬ সালের মে মাসে ঢাকা ইউনিভার্সিটির পূর্বদিকে খালি জায়গায় টিনশেড তৈরি করে শিক্ষাক্রম শুরু করা হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে ৩০টি মেডিকেল বেড দেয়া হয়। কোনো সার্জিক্যাল বেড ছিল না। প্রায় সব শিক্ষক ছিলেন খন্ডকালীন। প্রতি লেকচারে ২৫ টাকা করে মাসিক সর্বোচ্চ ৩০০ টাকা দেয়া হত। এঁদের নেয়া হত ঢাকা মেডিকেল কলেজ, মহাখালী পাবলিক এ্যান্ড ইনস্টিটিউট এবং সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ থেকে। যাত্রা শুরু হয় ৯ জন সার্বক্ষণিক এবং ১২ জন স্বল্পকালীন শিক্ষক নিয়ে।

পাকিস্তান কলেজ অফ ফিজিশিয়ানস্ এ্যান্ড সার্জনস্-এর হেড কোয়ার্টার ছিল করাচীতে। কোর্স কারিকুলাম ও পরীক্ষা নির্ধারিত হত এখান থেকে ২০-সদস্য বিশিষ্ট একটা কাউন্সিলের মাধ্যমে। ফাউন্ডার কাউন্সিলর হিসাবে পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রফেসর এ কে এস আহমদ, মো. ইব্রাহীম, আসিরউদ্দিন, জেড এ চৌধুরী এবং আমি। লে. জেনারেল ডব্লিউ এ ছিলেন প্রেসিডেন্ট, অধ্যাপক মো. আসিরউদ্দিন ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট। যাই হোক, আইপিজিএমআর কোর্স চালু হলেও ট্রেনিং-এর ব্যবস্থাপত্র, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ইত্যাদি হত করাচী থেকে। প্রথমবার পরীক্ষা হয় ১৯৬৮ সালে। সে-সময় যে-চারজন মেডিসিনে ফেলোশিপ লাভ করেন তাঁরা হলেন ডা. মুহম্মদ নাসিরউদ্দীন, ডা. আব্দুর

ইউএসটিসিতে অধ্যয়নরত দেশী বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম

রউফ ভূঁইয়া, ডা. মুহাম্মদ ইসহাক এবং ডা. মুহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম পেডিয়াটিক্স পাশ করেন ডা. মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম সার্জারিতে পাস করেন ডা. মুহম্মদ রুহুল আমীন। মোটকথা, ৬ জন পাস-করা ফেলো নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু।

পোস্ট গ্র্যাজুয়েট চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু বা আইপিজিএমআর প্রতিষ্ঠার আগে ১৯৬৫ সালে পূর্ব পাকিস্তানে এম আরসিপি, এফআরসিএস-এর সংখ্যা ছিল ৫০০-এর কাছাকাছি। এঁদের মধ্যে হয়তো অনেকেই ইতিমধ্যে চির বিদায় নিয়েছেন। যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের কেউ অবসর নিয়েছেন, কেউ বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন অথবা অন্যভাবে জীবনযাপন করছেন। স্বাধীনতা লাভের পর স্বাধীন সর্বভৌম বাংলাদেশ এঁদের ওপর নির্ভরশীল থাকলে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হত। মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, নানা স্বাস্থ্য কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জনশক্তির অভাবে নাজুক হয়ে পড়ত। মোটকথা, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হত এবং একটা স্বাধীন দেশ এ-বিষয়ে চরম সমস্যার সম্মুখীন হত। বাংলাদেশে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষা ও চিকিৎসাব্যবস্থা হাঁটিহাঁটি পা পা করে চলতে থাকে।

১৯৭২-১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবে বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্যে থেকে সরকারের সকল সাহায্য-সহযোগিতায় একদিকে পিজিকে যেমন সমৃদ্ধ করি, অন্যদিকে বিসিপিএসও এগিয়ে চলে ত্বরিত গতিতে।

ব্যক্তিগত রোষ এবং ভুল-বুঝাবুঝির শিকার হয়ে আমি চাকুরিচ্যুত হলেও সুপ্রিমকোর্টের রায়ে পরবর্তীতে বিজয়ীর বেশে আইপিজিএমআর-এ পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করি এবং তার কার্যক্রম চালাতে থাকি। ১৯৮৫ সালে অবসর গ্রহণের কথা থাকলেও সরকার

প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে নিজ উদ্যোগে ২ বছরের জন্য আমার চাকুরির মেয়াদ বৃদ্ধি করেন। ফলে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত আমি কাজ করার সুযোগ পাই। এ সময় সরকার আমাকে জাতীয় অধ্যাপকের সম্মান প্রদান করেন।

জামাল উদ্দিন : পি. জি হাসপাতালের দীর্ঘ ২৪ বছরের ইতিহাসে অনেক ঘটনার স্বাক্ষী আপনি। এমন একটি ঘটনা বলবেন যে ঘটনা আপনাকে খুবই আহত করে ?

ডা. নুরুল ইসলাম : সকালবেলা হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। নূরে আলম সিদ্দিকী একটা জরুরি ব্যাপারে যদি সম্ভব হয় কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা করতে চান। অনুমতি পেয়ে পনেরো-বিশ মিনিটের মধ্যে তিনি চলে এলেন। আমার সহকারী রহমান সাহেবকে বলা ছিল। সোজাসুজি ঘরে ঢুকে তিনি সালাম জানিয়ে বললেন, 'স্যার আপনার কাছে একটা জঘন্য অপরাধের বিচার চাইতে এসেছি। আপনার এক অধ্যাপক গতকাল অন্ধকার রুমে আমার এক শালীর চোখ পরীক্ষা করতে গিয়ে যা করেছেন তা বলার ভাষা আমার নেই। আমার স্ত্রী বাইরে অপেক্ষা করছিল। কেঁদে কেঁদে এসে আমার শালী বলল আর কোনোদিন সে এখানে আসবে না। ব্যাপারটা শুনে ভাবলাম আচ্ছা-সাজা দিই। পর মুহূর্তে মনে হল আপনি যখন আছেন বিচার পাব।' কথাগুলো বলতে বলতে তিনি সামনের টেবিলের বাঁ-পাশে আমার কথামতো বসে পড়লেন।

অধ্যাপকটির এহেন আচরণ শুধু আমার নয়, আরো অনেকের জানা ছিল। তাঁকে ঘিরে আরো দু-একটা ঘটনা পত্রপত্রিকায় স্থান পেয়েছিল। রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়ে তিনি রেহাই পেয়েছিলেন।

কথা দিলাম বিচার করবই। মনে মনে ভাবলাম অপরাধী অধ্যাপকটিকে ডেকে এনে মাফ চাওয়ানোর মাধ্যমে গুরুতর ব্যাপারটির সহজ সমাধান করতে হবে। তা না হলে শুধু তাঁর নয়, আমার প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে। অপ্রস্তুত অবস্থায় হঠাৎ ডেকে আনা হলে ভুল বুঝতে পারেন মনে করে টেলিফোনে জনাব নূরে আলম সিদ্দিকীর উপস্থিতির কথা জানিয়ে বললাম, যদি সম্ভব হয় যেন কামরায় আসেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি আমার কামরায় এসে উপস্থিত হলেন। কালো লোকটার চেহারা আরো কালো হয়ে গেল। চোখে মুখে অপরাধীর ভাব। সিদ্দিকী সাহেবকে সবিনয়ে সালাম জানিয়ে সামনের টেবিলের অপর পাশে বসলেন। তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললাম, 'হয়তো বুঝতে পারছেন কী কারণে আপনাকে ডেকে এনেছি ? ব্যাপারটিকে বেশিদূর গড়াতে না দেয়া ভালো। দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে চলে যান। সিদ্দিকী সাহেব আমার ওপর বিচারের ভার দিয়েছেন।' অধ্যাপক সাহেব সাথে সাথে বললেন, 'উনি যদি মনে করেন অপরাধ করেছি, তাহলে ক্ষমা চাব।' কথাগুলো শেষ হতে-না হতেই সিদ্দিকী সাহেব হাত গোটাতে গোটাতে বললেন, 'আমি একে থাপ্পড় দিয়ে ফেলে দেব স্যার। বলে কিনা 'উনি যদি মনে করেন'।

দেখলাম ব্যাপারটা গুরুতর রূপ নিচ্ছে। সিদ্দিকী সাহেবকে বললাম, 'আপনি বিচারের ভার আমার ওপর দিয়েছেন। বিচার আমি করবই। যদি করতে না দেন, কিছুই বলব

না। এখান থেকে বেরিয়ে যাব। আপনারা যা ইচ্ছা করেন।' তিনি চুপ করলেন। আমার অধ্যাপককে বললাম, 'বিতর্কে গেলে লাভ হবে না। বরং বিশেষ ক্ষতি হবে। অপরাধ যখন করেই ফেলেছেন, স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে এখনি এখান থেকে চলে যান।' ব্যাপারটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবার তিনি আমার কথা মতো বিতর্কে না গিয়ে সরাসরি অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে বেরিয়ে গেলেন।

সিদ্দিকী সাহেব আমার ওপর রাগ ঝেড়ে বললেন, 'স্যার আপনার জন্য বদমাইশটাকে শায়েস্তা করতে পারলাম না। তার একটা কান কেটে ফেলা উচিত ছিল। বেটা একটা ইতর।' পিওন ফিরোজকে চা দিতে বললাম। চা পান শেষে বিদায় নিতে নিতে সিদ্দিকী বললেন, 'স্যার আপনাকে আমার বাপের মতো শ্রদ্ধা করি। তা না হলে বদমাইশটাকে আচ্ছা-শিক্ষা দিতাম।' বললাম, 'যথেষ্ট হয়েছে। উনি জীবনেও ভুলবেন না।'

তিনি ভোলেননি। মনে করেছিলাম সারাজীবন ধরে বিনম্র, ভদ্র, কৃতজ্ঞ থাকবেন। স্বভাবও বদলে যাবে। কিন্তু পরবর্তীতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং উপ-প্রধানমন্ত্রী হবার সুযোগে তাঁর স্বরূপ দেখতে পাই। উপলব্ধি করলাম আমার ধারণা ভুল। ক্ষমতায় আসল পরিচয় মেলে, দুর্বলতায় নয়।

মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গ

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে পিজির দায়িত্ব পালন করেছেন প্রফেসর নুরুল ইসলাম দীর্ঘ ৯ মাস বঙ্গবন্ধুর পিতা মাতাকে পিজি হাসপাতালে কেবিনে রেখে চিকিৎসা তথা তাদের সকল প্রকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিলেন। যুদ্ধকালীন তিনি একশত কম্বল ও বিপুল পরিমাণ ঔষধ যক্ষ্মা হাসপাতাল থেকেই তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, ঐ দুঃসাহসী কর্মকান্ডের জন্য পাক হানাদার বাহিনীর রোষানলের শিকার হন কিন্তু ভাগ্যক্রমে ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ড থেকে অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান প্রফেসর নুরুল ইসলাম।

শরীফা বুলবুল : এবার আমরা জানতে চাচ্ছি বঙ্গবন্ধু প্রসঙ্গে। বঙ্গবন্ধুর সাথে কবে কোথায় প্রথম পরিচয় হল। কিভাবে পারিবারিক ভাবে সম্পৃক্ত হলেন ?

ডা. নুরুল ইসলাম : আমি কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র। ১৯৪৩ সালে ভর্তি হই। ঐ বছরের মাঝামাঝি সময়ে বিরাট এক সভা হচ্ছিল আমাদের কলেজে। করতালির খবর নিয়ে জানতে পারি এ সভায় প্রধান বক্তা ছাত্রনেতা শেখ মুজিব। ছাত্র সংসদ নির্বাচনে তাঁর সমর্থিত প্রার্থীকে তিনি বিজয় এনে দিয়েছেন। এ সভা ছিল তারই উৎস। তিনি থাকতেন বেকার হোস্টেলে। আমিও একই হোস্টেলে। দেখা হলে তার আকর্ষণীয় আচার আচারণে মুগ্ধ হতাম। আমি বিজ্ঞানে আর তিনি ছিলেন কলা অনুষদের। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে শেখ মুজিব বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক (জি.এস) নির্বাচিত হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এই কলেজ থেকে তিনি ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বি.এ পাস করেন। আমি আই এস সি পাস

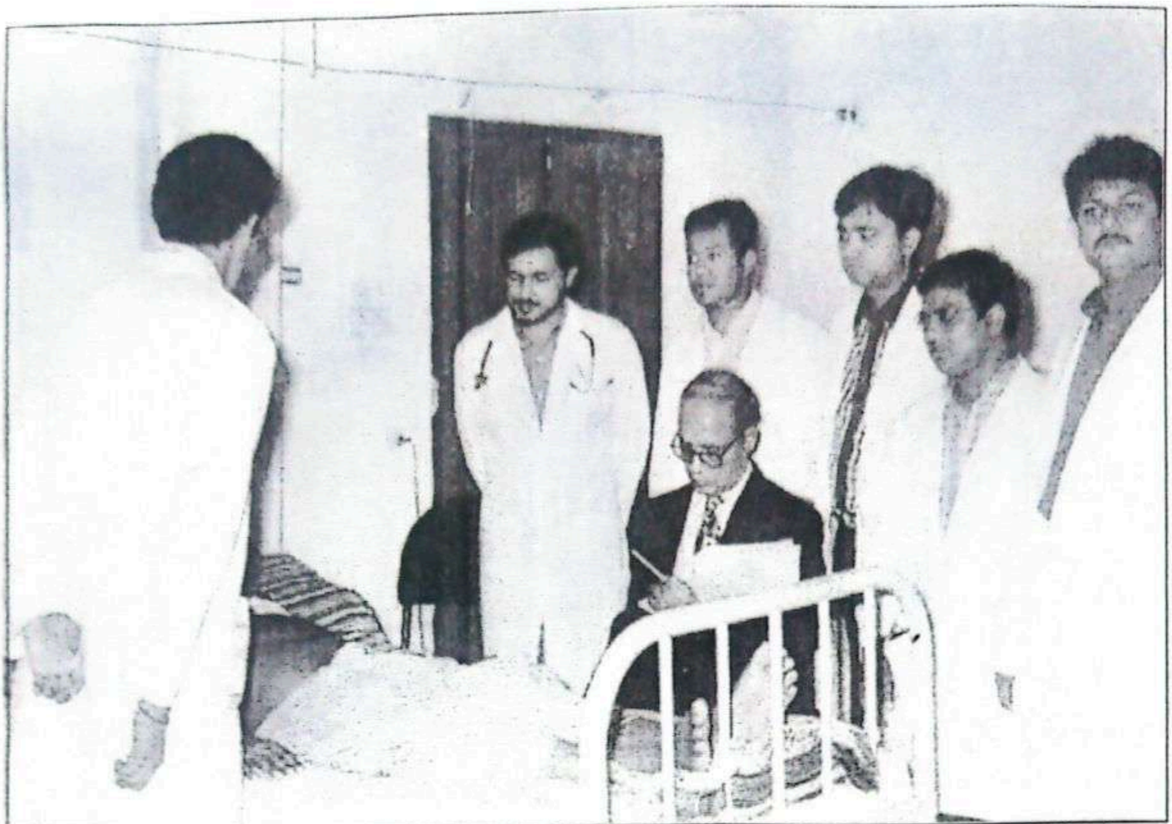

ইউএসটিসিতে এমবিবিএস ৫ম বর্ষের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা নিচ্ছেন জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম

করার পর কলকাতা মেডিকেল কলেজের তখন ছাত্র। অর্থাৎ সেই ইসলামিয়া কলেজ থেকে তিনি ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বি.এ পাস করেন। আমি আই এস সি পাস করার পর কলকাতা মেডিকেল কলেজের তখন ছাত্র। অর্থাৎ সেই ইসলামিয়া কলেজ থেকেই শেখ মুজিবের সাথে আমার পরিচয়। ১৯৫৭ সালে মাঝামাঝি মওলানা ভাসানী আমার তত্ত্বাবধানে মিটফোর্ড হাসপাতালে একটা কেবিনে ভর্তি হন। একদিন তাঁকে দেখতে এসেছিলেন হোসেন শহীদ সরওয়ার্দী, সঙ্গে ছিলেন শেখ মুজিব। মওলানা সাহেব এ দুজনের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেন বিশেষ প্রশংসার সাথে। শেখ মুজিব বেকার হোসেটলের আমাদের পূর্ব পরিচয়ের কথা জানালেন। ১৯৭০ সাল- আমার প্রথম ডাক পরে বঙ্গবন্ধু পরিবারে। বঙ্গবন্ধুর মা অনেক দিন থেকে অসুস্থ। আমিও তাঁর চিকিৎসা করার সৌভাগ্য বলে মনে হল। বললেন রাত ৯টার দিকে যেতে তখন বঙ্গবন্ধু থাকবেন। আমি রাজি হলাম। কথা হচ্ছিল বঙ্গবন্ধুর পারিবারিক চিকিৎসক অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ অধ্যাপক সুলতান আহামদ চৌধুরীর সাথে। যথা সময়ে ধানমন্ডির ৩২ নং বাড়িতে উপস্থিত হলাম। তখন বঙ্গবন্ধু তার মা-বাবার সাথে কথা বলছেন। বেগম সাহেবা, রেহানা ও রাসেল পাশাপাশি উপবিষ্ট। আমি সালাম দেওয়ার সাথে সাথে বঙ্গবন্ধু উঠে দাঁড়ালেন এবং আমার কাঁধে হাত রেখে তাঁর মায়ের উদ্দেশ্যে বললেন, দেশের সব চেয়ে বড় ডাক্তার নিয়ে এসেছি মা। এবার ইনশাল্লাহ তোমার অসুখ সেরে যাবে। বঙ্গবন্ধুর মা আমার দিকে তাকালেন এবং ইশারায় বসতে বললেন, পাশে আর একটি বিছানায় বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফর রহমান। তিনিও আমাকে বসতে বললেন। সুলতান সাহেব আর আমি পাশাপাশি বসলাম। পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলাম তিনি খুব লাজুক।

ইউএসটিসি'র প্রথম কনভোকেশনে গ্র্যাজুয়েটদের সাথে ইউএসটিসির প্রতিষ্ঠাতা জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম

শারীরিক দিক দিয়ে অনেকটা কাহিল। ক্রনিক ব্রনস্কাইটিস'। এর আগে অনেকেই তার চিকিৎসা করেছেন, তিনি অনেক ঔষধ খেয়েছেন। কিন্তু রোগ সারেনি। আমার আগমন ছিল রীতিমত একটা চ্যালেঞ্জ নির্ভরযোগ্য চিকিৎসক হিসেবে নিজেকে তাঁর কাছে প্রমাণ করতে না পারলে শুধু লজ্জার ব্যাপার নয়, এমন একজন রত্নগর্ভা মহীয়সী মহিলার চিকিৎসার সুযোগ হয়ত আর পাব না। আর বিশ্বাস হারালে তাও ফিরে পাওয়া কঠিন। প্রেসক্রিপশন লিখলাম, নির্দেশ লিখলাম দিনে ৩ বার, তারপর ২বার, তারপর ভাল হলে রাতে শুধু একবার করে খেতে হবে। বঙ্গবন্ধু বাইরের থেকে ঔষধ কিনে নিতে ইচ্ছে প্রকাশ করলে আমি বললাম হাসপাতাল থেকে পাঠিয়ে দেওয়াই ভাল। ঐ ঔষধ তেমন দামীও নয় সব বুঝিয়ে দিয়ে পাশের কামরায় যাওয়ার জন্যে যখন উঠে দাঁড়াই তখন বঙ্গবন্ধুর পিতা অতি বিনয়ের সাথে জানতে চাইলেন আমার সময় কীনা তিনি দু'একটা কথা বলতে চান। আমি বললাম বিনা দ্বিধায় বলতে পারেন। তিনি নাকি বহু বছর ধরে আলসারে ভুগছেন। পরীক্ষা করে দেখলাম পেটের এবং পায়ের এক্সরে করার জন্য একটা স্লিপ লিখে দিলাম। বললাম ভয়ের কোনো কারণ নেই। চিকিৎসা শেষে পাশের কামরার এসে দেখি চা, বিস্কিট, ফল এসব খাবার সামনে রেখে বঙ্গবন্ধু বসে আছেন। তিনি আমাকে এবং ডা. সুলতান আহমদ সাহেবকে বসে চা খেতে বললেন। আমরা পাশাপাশি বসলাম। তিনি মায়ের অসুখ সম্বন্ধে জানতে চাইলেন অভয় দিয়ে বললাম যে ওষুধ দিয়েছি তাতে উপশম হবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস। বঙ্গবন্ধু আশ্বস্থ হলেন। এই সুযোগে পাকিস্তানের জটিল রাজনীতি নিয়ে অনুমতি চেয়ে বঙ্গবন্ধুকে কয়েকটা প্রশ্নও করলাম। বঙ্গবন্ধুর আত্মপ্রত্যয় ও মনোবল দেখে মুগ্ধ হলাম। আমি উৎসাহ দিয়ে বললাম দেশবাসী আপনার সাথে আছে।

বিদায় নিয়ে দরজার কাছে আসতেই দেখি বেগম সাহেবা হাতে টাকা নিয়ে আমার ফিস্ দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। আমি মাফ চাইলাম, বললাম এ বাড়িতে ফিস্ নিতে আসিনি। এটা আমার একটা সৌভাগ্য।

বঙ্গবন্ধুর আম্মাকে প্রেসক্রিপশন দেয়ার পর স্বভাবতই ভাবনা ছিল ফলাফল কেমন হবে। দু'তিন দিন পর তাঁকে দেখতে যাই। আমাকে দেখেই তিনি খুব খুশি। অনেকটা সুস্থবোধ করছেন। পরীক্ষা করে দেখলাম শারীরিক অবস্থাও অনেকটা ভাল। বুক অনেক পরিস্কার। কিছুক্ষনের মধ্যে দেখি অনেক খাবার টেবিলে দেওয়া হয়েছে। এই পর্ব সেরে বিদায় নেবার আগে তাঁকে যখন দোয়া করতে বলি, তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দু'হাত তুলে দোয়া করলেন।

দুই তিনদিন পর আমার পরামর্শে বঙ্গবন্ধুর পিতার এক্সরে করা হলো। দেখা গেল পেটে সামান্য আলসার, হাটুতে বার্ধক্যজনিত রোগ, রোগটার ইংরেজী নাম অস্টিও আরথ্রাইটিস, সারবার নয়। পেটের আলসারের ঔষুধ খাওয়ার কিছুক্ষণ পর ব্যথার ওষুধ খেতে দিলাম। এবং দুটো ওষুধ লিখে দিলাম। অনুরোধ জানালাম যেন ওষুধ নিয়মিত খান। আর খুব বেশি ব্যথা না হলে ব্যথার ওষুধ যেন না খান। এই চিকিৎসা পরবর্তীতে তিনি অনেক দিন চালিয়ে যান। দুই এক মাস পর পর গোটা ৫/৬ ভিটামিন ইনজেকশন দিয়ে তার বিশ্বাস জন্মাবার চেষ্টা করতাম। তিনিও খুশি হতেন, সুস্থতা অনুভব করতেন। মাসে দু'একবার বঙ্গবন্ধুর মাকে দেখতে যেতাম। প্রতিবারই হয় বেগম সাহেবার হাতে না হয় তার নির্দেশে চা অথবা চিনির সরবত এবং মিষ্টি আমি যাওয়ার সাথে সাথে বিছানার পাশে টেবিলে দেয়া হত। হাতে ইশারা করে তিনি আস্তে আস্তে বলতেন ওগুলো খেতে। এ আতিথেয়তা এই বাড়িতে প্রচলিত ছিল। এ ভাবেই বঙ্গবন্ধু পরিবারের সাথে আমার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠে।

শরীফা বুলবুল : আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের রক্তঝরা নয়মাস। জাতির এই দুঃসময়ে আপনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বৃদ্ধ পিতা-মাতার চিকিৎসা তথা তাদের লুকিয়ে রেখেছিলেন আপনার হেফাজতে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা (সাবেক প্রধানমন্ত্রী)অনেকের সাথে আপনার যোগাযোগ তথা আশ্রয় দিয়েছিলেন। এই সময়ে বুদ্ধিজীবী হত্যার পাকহানাদারদের নীল নক্সা থেকে কিভাবে আপনি বেঁচে গেলেন। রক্তঝড়া সেই দিনগুলোতে আপনি কোথায় ছিলেন, কিভাবে ছিলেন তা অনেকেই জানেন না। আমরা আপনার মুখ থেকে সেই ভয়াল দিনগুলোর উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা জানতে চাচ্ছি ?

ডাঃ নুরুল ইসলাম : অক্টোবর মাসের শেষের দিকে একদিন বিকেল বেলা রোগী দেখছি। এমন সময় আমার সহকারী এসে বলল বঙ্গবন্ধুর কন্যা হাসিনা এসেছেন। আমি বাইরে আসতেই সালাম জানিয়ে তিনি বললেন, 'দাদুর অসুখ, হাসপাতালে ভর্তি করলে ভাল হয়। আপনি কি একবার দেখবেন ?'

ভাবলাম যদি দেখতে যাই, তাহলে উভয়পক্ষে কত রকম না বিপদ আসতে পারে। দুষ্ট

লোকেরা নানা রং দেবে। কেউ কেউ বলবে সাজানো। বললাম, 'এম্বুলেন্স পাঠাচ্ছি হাসপাতালে ব্যবস্থা করে দেব। কোন অসুবিধা হবে না ।' তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরানো কলাভবন থেকে শাহবাগ হোটেলে অর্থাৎ বর্তমান স্থানে পি জি হাসপাতাল স্থানান্তরের কাজ শুরু হয়েছে। রোগীর তেমন কোন ভীড় নেই। চক্ষু বিভাগের দুটো রুম খালি ছিল। এর মধ্যে একটা কামরা বঙ্গবন্ধুর পিতামাতার জন্য ঠিক করে দেই। ডাঃ নাসিম হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক, এফসিপিএস পাশ চমৎকার ব্যবহার। আমার নির্দেশে বঙ্গবন্ধুর পিতামাতাকে পূর্বনির্ধারিত কামরায় ভর্তি করা হল। নাসিমকে নির্দেশ দিলাম তাদের দিকে খেয়াল রাখতে। এ সময়ে আমার হাউজ ফিজিশিয়ান হিসাবে ছিল ডাঃ হাজেরা মাহতাব। দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ন সজাগ এবং ব্যবহারেও অমায়িক। ডাঃ মোঃ ইব্রাহিম সাহেবের সুযোগ্য কন্যা। অস্বস্তিকর রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই দুইজনের সংযোগ আমার জন্য কতটুকু স্বস্থিকর ছিল তা আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি। কখন কোত্থেকে কিভাবে চ্যালেঞ্জ কিংবা নির্দেশ আসে তার কোন নিশ্চয়তা ছিল না।

ভাবলাম একা দায়িত্ব নেওয়া ঠিক হবে না। শুধু জল্পনা কল্পনা নয়, নানা ষড়যন্ত্র বাসা বাঁধবে। আমাকে যারা আপন ভাবতে পারে না অথবা ঈর্ষা করে এই সুযোগ নিয়ে তারাই আমাকে বিপদে ফেলতে চেষ্টা করবে। বঙ্গবন্ধুর পিতামাতাকে অহেতুক কষ্ট দেবে। অন্যদিকে যদি কয়েকজন বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে একটা মেডিকেল বোর্ড রোগীদের অবস্থা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করে সেটা নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলতে সুযোগ পাবে না। ভেবে চিন্তে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ কর্নেল মালিক, স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ মান্নান এবং শল্যবিদ শেখ আলি আশরাফকে নিয়ে একটা বোর্ড গঠন করি। আমি এর চেয়ারম্যান হিসাবে থাকলাম। আমাদের সিদ্ধান্তকে সকলেই অরাজনৈতিক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে মেনে নেবে এ ভরসা ছিল। আমরা সকলেই নিরাপদ থাকব। মেডিকেল বোর্ড উভয়কে পরীক্ষা করে পুরো বিশ্রামের নির্দেশ দিল।

কিছুদিন পর শেখ হাসিনা আর তাঁর স্বামী ডঃ ওয়াজেদ আমার সাথে বাসায় দেখা করতে এলেন। বললেন, হাসপাতাল থেকে তাঁদের ছেড়ে দিলে ভাল হয়। এমনিতেই হাসপাতালের দেনা বেড়ে যাচ্ছে, এত টাকা একসাথে দিতে তাঁদের কষ্ট হবে। বললাম, 'টাকাই যদি একমাত্র সমস্যা হয় তাহলে তাঁদের হাসপাতাল ছেড়ে যাওয়া উচিত হবে না। দুজনের কেউ এখনও পুরো সুস্থ নন। তাছাড়া বাইরে কোথায় কিভাবে থাকবেন। কে দেখবেন তাঁদের।' বললাম, 'টাকা লাগবে না। সেটা আমার উপর ছেড়ে দিন। তাঁদের হাসপাতালে থাকাই উচিত হবে।' শুনে তাঁরা আশ্বস্ত হলেন। এই সময়ে দাদা দাদির চিকিৎসার খরচ মেটানো নিশ্চয় তাঁদের পক্ষে সহজ ছিলনা। আমার কথা শুনে তাঁরা কিছুটা স্বস্তিবোধ করলেন মনে হল। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে উভয়ে বিদায় নিলেন। তাঁদের সরলতায় মুগ্ধ হলাম।

বেগম মুজিব তখন গৃহবন্দী। প্যারোলে প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি আসতেন। ঘন্টা দু'এক

প্রথিতযশা সাংবাদিক নাসির উদ্দীন ও তাঁর সুযোগ্য কন্যা সাপ্তাহিক বেগম পত্রিকার সম্পাদক নুরজাহান বেগম, বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক প্রয়াত রোকনজ্জামান খান দাদা ভাইয়ের সাথে অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম

পর চলে যেতে হত। এই সুযোগে তিনি শেখ রেহানা এবং অন্যান্যদের নানা উপদেশ ও নির্দেশ দিয়ে যেতেন। এক সময় আমি জানতে পারি এ সুযোগে কেবিন থেকে লুকিয়ে রাখা নানা অস্ত্রশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তুলে দিতে রেহানার দায়িত্ব ছিল। বেগম সাহেবের সাথের বন্দুকধারীরা একদিন নার্সদের সাথে খারাপ ব্যবহার করলে তিনি ধমক দিয়ে বললেন, 'আমি তোমাদের অফিসারদের কাছে রিপোর্ট করব।' বেগম সাহেবার সাহস ও ব্যক্তিত্ব দেখে সংশ্লিষ্ট মহল মুগ্ধ হতো। আমি জানতাম তিনি প্রায়ই আসতেন। তবু ইচ্ছে করে ঘন ঘন দেখা করতাম না। ভাবতাম দূরে থেকে সাহায্য করা ভাল। ঘণিষ্ঠতা হয়ত বিপদ ডেকে আনতে পারে। আমার জন্য না হলেও বঙ্গবন্ধুর পিতা মাতার জন্য।

দিনের পর দিন এমনি করে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। নভেম্বরের মাঝামাঝি একদিন ডঃ ওয়াজেদ অনুরোধ করে দু'জনকে নিয়ে গেলেন হাসপাতালের বাইরে। ভেবেছিলেন সেখানেই নিরাপদ হবে এবং হাসপাতালের একঘেয়েমি থাকবেনা। বুড়ো বুড়ী দু'জনই সুস্থবোধ করবেন। কিছুদিন যেতে না যেতেই সবাই ভুল বুঝতে পারল। ডঃ ওয়াজেদ এবং আরও ২/১ জন আমার কাছে এসে স্বীকার করলেন, বাইরে যাওয়া ভুল হয়েছে হাসপাতালের চাইতে অসুবিধে সেখানে ঢের বেশী। দেখাশুনার লোকও নেই ডাক্তারের তো কথাই উঠে না। কোন রকম বিরক্তির ভাব না দেখিয়ে আমি তাঁদের জন্য হাসপাতালে ব্যবস্থা করব বলে উৎসাহ দেখালাম। আগের সীটগুলো তখন খালি ছিল না। দোতলায় ১১৪ নং ও ১১৫ নং পাশাপাশি দুটো কেবিন খালি ছিল।

অপর একটি ঘটনা সেদিন ছিল ১১ ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল। অন্য দিনের মত সকাল বেলা

নামাজ পড়ে কোরআন পাঠ করছিলাম। তারপর আমার নিকট আত্মীয় ডাঃ আবদুল ওয়াদুদের সাথে আলাপ করে ঠিক করলাম, সবাই বাড়ী ছেড়ে চলে যাব। এখানে নিরাপদ নয়। অনেকে ইতিমধ্যে নদীর ওপাড়ে জিঞ্জিরায় আশ্রয় নিয়েছে। ওয়াদুদের সাথে আলাপ করে ঠিক করলাম সবাইকে নিয়ে আমিও সেখানে চলে যাব। ভাইপো ফিরোজ নীচের তলার পশ্চিম দিকে থাকে। কে যেন এসে বলল সে কাঁদছে। তার সেখানে যাবার ইচ্ছে নেই। জোর করে তাকে নেয়া ঠিক হবে না ভেবে জিঞ্জিরা যাবার প্রসঙ্গ বাদ দিলাম।

প্রতিদিন ওয়াদুদ আমার বাসায় আসে। কোথাও না কোথাও হত্যা-লুঠপাটের খবর শুনে সিদ্ধান্ত নিই এবার অন্য কোথাও আশ্রয় নিতে হবে। পরে খবর পাই যেখানে আশ্রয় নেয়ার কথা সেখানেও এমন কিছু ঘটে গেছে। কাউকেও না কাউকেও হত্যা করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম বাইরে কোথায়ও যাওয়া নিরাপদ হবে না। দুদিন পর অর্থাৎ ১৩ তারিখ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলাম পরিবারের সকলে অর্থাৎ নিকট আত্মীয়রা, বিশেষ করে ওয়াদুদের পরিবারসহ আমরা দু'ভাগ হয়ে একদল যাব পি.জি হাসপাতালে আর একদল অভয় দাশ লেইনে আমার প্রতিষ্ঠিত যক্ষ্মা পুনর্বাসন কেন্দ্র আর.আর.সি.তে। ডাঃ ওয়াদুদ, ফিরোজ, ভাইঝি নীলুকে আর.আর.সি.তে পাঠিয়ে দিলাম। মা, ছেলেমেয়ে, স্ত্রীকে নিয়ে আমরা হাসপাতালে চলে যাব ঠিক হল। অতঃপর আমরা চলে গেলাম।

বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের জন্য ১৪ ডিসেম্বর ছিল একটা কালো দিবস। এই দিন আলবদররা নিজ নিজ বাড়ী থেকে চোখ বেঁধে তুলে নিয়েছিলো আমার পরম হিতৈষী উদীয়মান চিকিৎসক ডাঃ ফজলে রাব্বি এবং বিশিষ্ট চক্ষু বিশেষজ্ঞ ও সমাজ সেবী ডাঃ আলিম চৌধুরীসহ আরো অনেককেই। একই দিন আমার বাড়ীতেও তারা হানা দিয়েছিল। বাড়ীর বাবুর্চি রোজারিওর কাছে জানতে চেয়েছিল আমরা কোথায়। আমার নির্দেশ মতো সে যদি মোকাবিলা করতে না পারত তাহলে জানিয়ে দিত আমাদের ঠিকানা। আর তাহলে সে দিনের ১৪ ডিসেম্বরের রাতে অনেক শহীদের পাশে হয়তবা আমরাও মিরপুরের বধ্যভূমিতে শায়িত থাকতাম।

আজ আমরা বেঁচে আছি। কিন্তু একটি করুণ কাহিনী কখনও ভুলতে পারব না। ১৫ ডিসেম্বর ফজলে রাব্বির বাড়ীতে তার জানাযায় শরীক হতে গেলাম। মিরপুরের বধ্যভূমি থেকে তার লাশ ঘরে আনা হয়েছে। আমাকে দেখেই তাঁর স্ত্রী কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। বললেন, 'স্যার দেখতে এসেছেন ? আসুন। এ বলে আমাদের ঘরের এক পাশে নিয়ে গেলেন। দেখালেন ডাঃ রাব্বীর সাজানো গুছানো শার্ট, লুঙ্গি, গেঞ্জি, তোয়ালে ইত্যাদি। প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় কাপড় চোপড়। এগুলো গুছানো হয়েছিল সাথে করে নিতে। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হবেন। আমরা যেভাবে পিজিতে আশ্রয় নিয়েছিলাম তাঁরাও একইভাবে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আশ্রয় নেবেন। যাবার জন্য সবাই প্রস্তুত। বাড়ী থেকে বের হবেন এমন সময় তার এক

১৯৬২ সালে বর বেশে নববধূর পাশে জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম সাথে বাঁম থেকে ডা. গিয়াসউদ্দিন, সিদ্দিক আহমদ চৌধুরী, অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী ও কাছের স্বজনেরা ।

প্রিয় ছাত্রের টেলিফোন আসে। সে বলে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পাশের পুকুরে বোমা পড়েছে। এ অবস্থায় মেডিকেল কলেজ নিরাপদ হবে না মনে করে সেখানে যাবার পরিকল্পনা তিনি ত্যাগ করেন। মিসেস রাব্বিকে বললেন আমাকে টেলিফোন করে জানাতে। পিজিতে যাওয়া যায় কিনা।

মিসেস রাব্বি আমার বাসায় বহুবার টেলিফোন করেন। 'হ্যালো' বললেই রোজারিও আমার নির্দেশ মতো টেলিফোন নামিয়ে রাখে। কয়েক বার চেষ্টা করার পর যোগাযোগ যখন সম্ভব হল না ডাঃ রাব্বি তাঁর স্ত্রীকে বললেন যে তিনি আর কোথাও যাবেন না। যদি আমাদের মতো তিনিও সেদিন পিজিতে আশ্রয় নিতেন, তাহলে আজ এমন পরিণতি হত না। শুনে আঘাত পেলাম। নিজের আত্মরক্ষার জন্য নির্দেশ এমন একটা নির্মম পরিণতি ডেকে আনতে পারে তা কল্পনাও করিনি।

সেই মুহূর্তে মনে পড়েছিল তাঁর অনুরোধের কথা। কয়েক দিন আগে তিনি আমাকে

অনুরোধ করেছিলেন বাড়ী ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে। কারণ নানা সুত্রে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে আমরা কেউ নিরাপদ নই। যে কোন সময় আলবদর বাহিনী আমার বাড়ীতে হানা দিতে পারে।
তাঁর উপদেশে আমি বিপদমুক্ত হলেও তিনি প্রাণ হারালেন এমন করুণভাবে। নিজের কাছে নিজেকে অপরাধী মনে হল। সেদিন মিসেস রাব্বিকে সান্ত্বনা দেবার কোন ভাষা আমার ছিল না। বললাম, 'সবই আল্লাহর ইচ্ছে। তা না হলে কেন তিনি হাসপাতালে খবর নিলেন না। কেউ না কেউ টেলিফোন ধরে জবাব দিত। তিনি জানতে পারতেন আমরা কোথায়।'
আরও কয়েকজন বন্ধুর সাথে জানাজায় শরীক হলাম। জানাজা শেষে মুখ দেখানো হয়। চেহারা বিকৃত। তবুও চেনা যায়। সকলেই ব্যথিত ও মর্মাহত। তখন মনের ভাব মুখে প্রকাশ করার কোন উপায় ছিল না।
জামাল উদ্দিন : আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের নয় মাসে আপনার স্মরণীয় কোন ঘটনা ?
ডা. নুরুল ইসলাম : ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর হবে, নিচ তলায় রোগী দেখছি। পিয়ন এক-টুকরো কাগজ এনে দিল। লেখা ছিল 'আর.এন.দত্ত', বিছানায় শোয়ানো রোগীটা দেখা শেষ করেই তাঁকে ডেকে পাঠালাম। আমার অতি পরিচিত দত্ত বাবু নতুন রূপ নিয়েছেন। মাথায় টুপি, মুখ ভরা দাড়ি-গোঁফ, মুসলমানি পোশাক। ভেতরে ঢুকেই তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন। বললেন, 'শারীরিক এবং মানসিকভাবে বহু কষ্টে আছি, দোকানপাট সব শেষ, আমাকে বাঁচান।' বললাম, ভয় পাবার কিছু নেই, তবে এ নাম লিখে পাঠালেন কেন ? আমার ছেলেটা যখন নাম ধরে ডাকবে, সবাই জানতে পারবে আপনি হিন্দু। অথচ ঐ পরিচয় গোপন রাখতেই আপনি এমন ছদ্মবেশ নিয়েছেন। জানেন বাইরে আমার চেনা কমপক্ষে দুজন পশ্চিম পাকিস্তানি আছে ? এ ভুল কোনোদিনও করবেন না। আপনার নাম বদলাতেই হবে এবং তা এমন হবে যাতে জাতের পরিচয় মিলবে না। এ-মুহূর্ত থেকে আপনার নাম হবে মি. চৌধুরী। এটা মনে রাখতেই হবে। এ নামেই আপনাকে কালকে কেবিনে ভর্তি করে নেব। কোনোক্রমেই কেউ যেন আপনার আসল নাম এবং পরিচয় জানতে না পারে।' পরদিন তাই করা হল, চৌধুরী নামে তিনি পি.জি-তে ভর্তি হলেন। সবাই জানেন তিনি জাতে মুসলমান, নাম মি.চৌধুরী। মাসখানেক হাসপাতালে থাকার পর তিনি ছাড়পত্র পেলেন একই নামে। তারপর দু-একবার দেখা হয়েছে। নাম বদলাননি সঙ্গত কারণে।
নভেম্বর মাস। শীত পড়ছে বেশ। মুক্তিযোদ্ধা ডাক্তার গাজী এসে অনুরোধ করল কিছু ওষুধ এবং শীতের কাপড় দিতে। অনেক মুক্তিযোদ্ধা শীতে কষ্ট পাচ্ছে। তাকে দু'দিন পর আসতে বললাম। কয়েকটি ওষুধ কোম্পানিকে ডেকে বললাম, গরিব রোগীদের জন্য কিছু ওষুধ দিতে। উৎসাহজনকভাবে তারা সাড়া দিল। বেশকিছু ওষুধ জোগাড় হল। আসল উদ্দেশ্য তাদের জানা ছিল না। জানানো নিরাপদও ছিল না।
টিকাটুলিতে আমার তত্ত্বাবধানে যক্ষ্মা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র চালু ছিল। কিছুদিন আগে

তিন সন্তান দীনা, নীনা ও ইফতেখারের মাঝে জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম

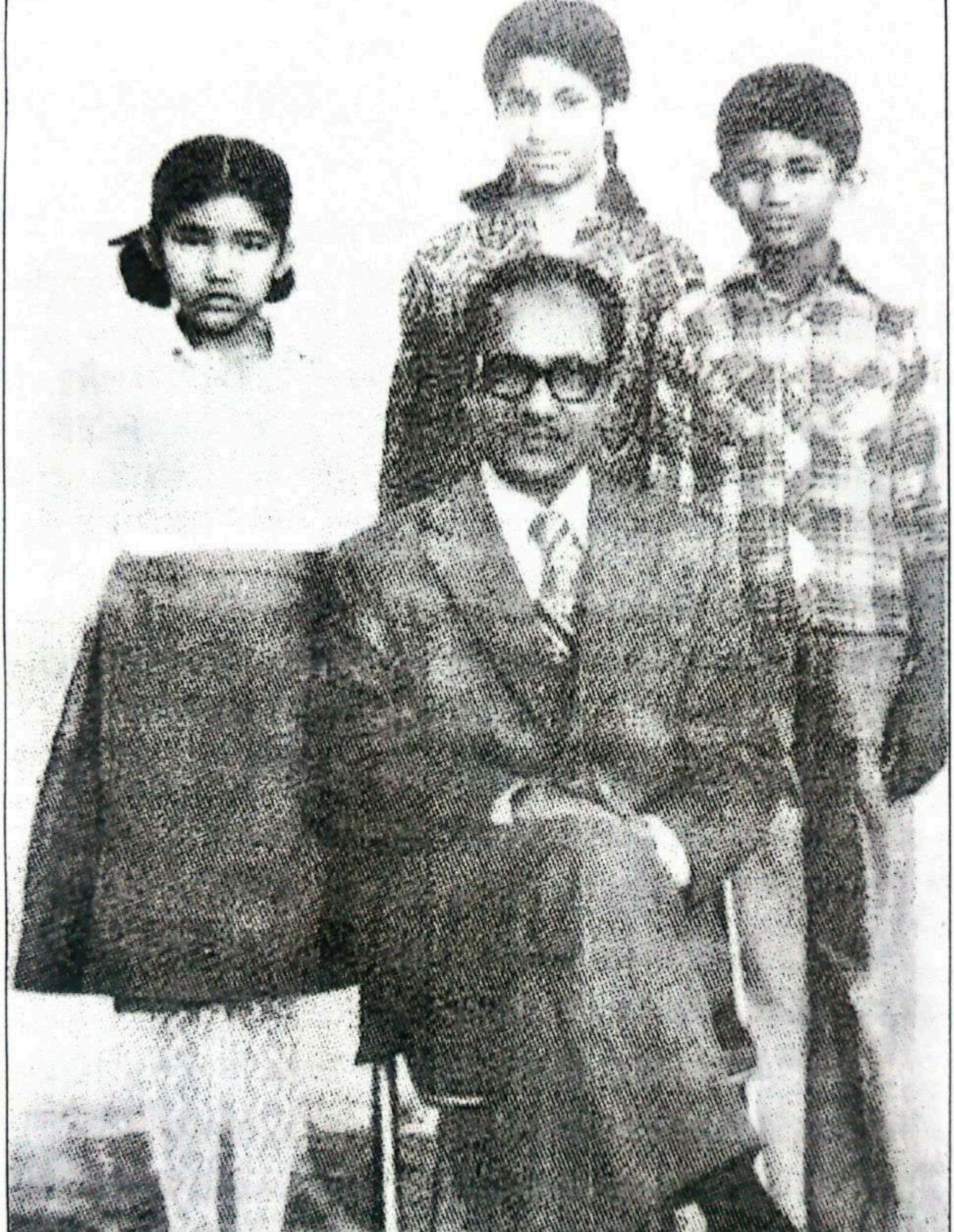

তিন সন্তান দীনা, নীনা ও ইফতেখারের মাঝে জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম

রেডক্রস থেকে এ কেন্দ্রের জন্য তিনশ কম্বল আনা হয়। রোগীর সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ। এদের প্রত্যেককে একটা করে দেবার পর বাকি আড়াইশ কম্বল রাখা হয়েছিল স্টোরে। স্টোর-অফিসারকে ডেকে বললাম, একশ কম্বল আলাদা করে গোপনে আমার গাড়িতে

দিতে। এ একশ কম্বল আর ওষুধ ভোর রাতে গাজীর হাতে তুলে দিলাম। আর এদিকে স্টোর-অফিসার আমার নির্দেশে আমাকে এবং অন্যান্য সদস্যদের জানিয়ে দিল স্টোর থেকে একশ কম্বল চুরি গেছে। অফিসের নথিপত্রে লেখা হল। কার্যকরী কমিটির সভায় দুঃখ প্রকাশ করা হল। আমরা দুজন ছাড়া কেউ আসল ব্যাপার জানলেন না।

স্বাধীন বাঙলার স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন জহুর আহমদ চৌধুরী। ঢাকা মেডিকেল কলেজে তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন করা হল। গ্যালারিতে, দরজায় তিল ধরবার জায়গা নেই। আমিও সেখানে উপস্থিত। গাজী বক্তৃতা দিতে শুরু করল। মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা জহুর আহমদ চৌধুরীর অবদান ইত্যাদি ইত্যাদি। হঠাৎ আমার নাম উচ্চারিত হল। বিচলিত হলাম। সে বলল, 'মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে অধ্যাপক নুরুল ইসলাম আর যাই করুক না কেন চুরি করেছেন।' হল স্তব্ধ। সকলে অবাক। অনেকের চোখ আমার দিকে। কেউ কেউ হয়তো ভেবেছেন, শেষ পর্যন্ত আমি চুরি করলাম !

গাজী কী বলতে চাচ্ছিল সেটা আমার ভাবনার অতীত ছিল না গোটা ব্যাপারটা আমাদের তিনজনের জানা ছিল- আমি, স্টোর-অফিসার ও গাজী। মনে মনে হাসছিলাম এ ভেবে যে, তার পরবর্তী ঘোষণা সব ফাঁস করে দেবে। আমার প্রকৃত স্বরূপ সকলে জানতে পারবে। গাজী বলতে শুরু করল, 'আমি আবারও বলছি, অধ্যাপক নুরুল ইসলাম চুরি করেছেন। হ্যাঁ, তিনি চুরি করেছেন অনেক ওষুধ এবং হাসপাতালের একশ' কম্বল। মুক্তিযোদ্ধা ভাইদের পক্ষ থেকে আমি অনুরোধ জানিয়েছিলাম কিছু ওষুধ এবং শীতের কাপড় দিয়ে সাহায্য করতে। তিনি আমাকে এগুলো জোগাড় করে দিয়েছিলেন। দারুণ শীতে আশ্রয়হীন মুক্তিযোদ্ধাদের এগুলো কত উপকারে এসেছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সত্যি বলতে কী কম্বলগুলো তিনি চুরিই করেছিলেন, আর ওষুধ নিয়েছিলেন মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে কোম্পানি থেকে। উদ্দেশ্য ছিল মাতৃভূমিকে দখলদার পাক বাহিনীর হাত থেকে মুক্ত করার সংগ্রামে যারা লিপ্ত তাদের সহায়তা করা। এ চুরি আসলে চুরি নয়, সৎ কাজের জন্য

বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত চিকিৎসক

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন প্রফেসর ডা. নুরুল ইসলাম। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধু স্বপরিবারে স্বাধীনতা বিরোধীদের হাতে নিহত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত।

সঙ্গোপনে কিছু নেয়া।' এবার সবার দৃষ্টি আমার দিকে। আমি তৃপ্তির হাসি হাসলাম।

জামাল উদ্দিন : আপনি বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন, কোন অবস্থায়, কিভাবে বঙ্গবন্ধু আপনাকে চিকিৎসক হিসেবে নিযুক্ত করলেন ?

ডাঃ নুরুল ইসলাম : স্বদেশে ফিরে প্রতিদিন সকালে বঙ্গবন্ধু গণভবনে যান। আজকের সুগন্ধা আয়ুবী আমলের প্রেসিডেন্ট ভবন। প্রথমদিকে বঙ্গবন্ধুর আমলে ছিল গণভবন।

১৯৮২ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় আঞ্চলিক কমিটির ৩৮তম অধিবেশনে অন্যান্যদের সাথে জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম।

প্রচণ্ড ভীড় লেগেই থাকে। প্রথম দু'একদিন দেখা করতে চেষ্টা করিনি। ভাবলাম তাঁর সাথে দেখা করা আমার একটা নৈতিক দায়িত্ব। একদিন গিয়ে দেখি বাইরে বারান্দায় অনেক লোকের ভীড়। আমাকে দেখে কে একজন সাথে সাথে ভিতরে নিয়ে গেল। বঙ্গবন্ধু তখন শিল্পপতি ইস্পাহানীর সাথে কোলাকুলি করছেন হঠাৎ আমাকে দেখে কোলাকুলি ছেড়ে সামনে এগিয়ে এসে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তাঁর (ইস্পাহানীর) দিকে তাকিয়ে আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'হি ইজ মাই ফাদার। ইনি আমার পিতা, ইনি আমার বাবা মা'কে বাঁচিয়েছেন। আবার আমাকে গভীর আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলেন। এ সময় বঙ্গবন্ধুর চোখে মুখে কৃতজ্ঞতার ভাব ফুটে উঠেছিল। এমন এক বিশাল ব্যক্তিত্বের কোমল চাহনি আমার কাছে মনে হয় এই সেদিনের ঘটনা। বুকে জড়ানো অবস্থায় বঙ্গবন্ধু বললেন, 'ডাক্তার সাহেব হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ' আমি আপনার জন্য কি করতে পারি ? আপনি যা কিছু চান!'

আমি আবেগের সুরে বললাম, ' যা পাবার আমি পেয়ে গেছি। আমরা সবাই আপনাকে চেয়েছিলাম, আর কিছু চাওয়ার নেই।'

আমার দিকে তিনি একনজরে তাকিয়ে রইলেন।

চারদিকের সবার দৃষ্টি আমাদের উপর। বঙ্গবন্ধু আমাকে বসতে বললেন।

পরে আবার দেখা করব বলে অনুমতি নিয়ে সেদিন বেরিয়ে আসলাম। এ সময় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর সচিব রফিকউল্লাহ চৌধুরী ছিলেন অন্যতম। কয়েক দিন পর একদিন বিকেলবেলা চেম্বারে রোগী দেখছি এমনসময় হঠাৎ গণভবন থেকে টেলিফোন আসে রফিকউল্লাহ চৌধুরীর। তিনি বললেন, 'বঙ্গবন্ধু কথা বলবেন আপনার সাথে।' আমি অবাক হলাম। রিসিভার হাতে তুলতেই শোনা গেল,

প্রেসক্রিপশন গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসবে আলোচকদের সাথে (ডান থেকে বসা) সাংবাদিক মাহফুজ আনাম, ব্যারিষ্টার ইসতিয়াক আহমদ, ব্যারিষ্টার মঈনুল হোসেন, (দাঁড়ানো ডান থেকে) জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম, আসমা আব্বাসী,ডা. তাহির, ড. মুস্তফা-নুর-উল ইসলাম এবং ড. সেলিম জাহাঙ্গীর।

'আচ্ছালামু আলাইকুম, ডাক্তার সাহেব।'

'আসসালামু আলাইকুম স্যার।'

'আপনাকে আমার ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসাবে পেতে চাই। পয়সা দিতে পারব না।'

'এটা আমার জন্য পরম সৌভাগ্য এবং গৌরবের। টাকা পয়সা দিলেও নিতাম না।'

'কেন ?'

'আমরা গরীব।'

'আপনি কি রাজী, ডাক্তার সাহেব ?'

বললাম, 'আপনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলে সম্মানীর জন্য অনুরোধ জানাতাম। এখন দিলেও নেব না। এ টাকা আমার দেশ অর্থাৎ স্বাধীন বাংলাদেশে থাকবে, পাকিস্তানে যাবে না।'

বঙ্গবন্ধু বললেন, 'আপনার যুক্তি চমৎকার মেনে নিলাম ডাক্তার সাহেব।'

টেলিফোন রাখলাম। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্মদাতার ব্যক্তিগত চিকিৎসক হওয়া কত বড় সৌভাগ্যের কথা ভেবে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করলাম। ব্যক্তিগত চিকিৎসকের দায়িত্ব সম্বন্ধে আমি তখনও ওয়াকেফহাল ছিলাম না।

বঙ্গবন্ধুর ছোটবোন মিসেস সৈয়দ হোসেন ছিলেন একজন নিতান্ত সহজ সরল মহিলা। বঙ্গবন্ধুর ভাইবোনের মাঝে তিনি সবচেয়ে ছোট। একদিন দেখা হতেই বললেন, 'প্রথম রাতেই আব্বা আম্মা প্রায় গোটা রাত জুড়ে আপনার কথাই ভাইকে (বঙ্গবন্ধুকে)

বলেছেন। কিভাবে ভর্তি করলেন, কেমনভাবে সাহায্য করেছেন, এসব।'
আমি জানতাম আমার প্রতি বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গবন্ধুর পরিবার-পরিজনের স্নেহ, ভালবাসা আর বিশ্বাস কতটা অটুট ছিল এ বিষয়ে বারে বারে প্রমাণ পেয়েছি।

জামাল উদ্দিন : বাকশাল কর্মসূচী এটা ভালো ছিল না খারাপ ছিল এ প্রসঙ্গে কোনো কথা হয়নি আপনার বঙ্গবন্ধুর সাথে ? যেহেতু আপনি সবসময় তাঁর কাছাকাছি থাকতেন ?

ডা. নুরুল ইসলাম : বাকশাল সম্পর্কে ধারনাটা ভালো ছিল, কিন্তু প্রসেসটা ভুল হয়েছে। এখন বিএনপি যে গ্রাম সরকার-টরকার করছে এটা বাকশালেরই চিন্তাধারা, সেই চিন্তাধারা নিয়েই বাকশাল করেছিলেন। আমার মনে হয় বাকশালই তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একদিকে তিনি গণতন্ত্র থেকে ডিক্টেটরশীপে চলে এসেছিলেন। লোকে বলত বঙ্গবন্ধু জীবনভর গণতন্ত্রের জন্য যুদ্ধ করেছেন, তিনি আবার বাকশাল করে একদলীয় নেতৃত্ব দান করছেন, এটা একটা বিরাট ভুল করেছেন। তিনি অন্য দল গড়লে লোকে কি ভাবত জানি না, কিন্তু কথা উঠত। যিনি সারা জীবন ধরে যেটার জন্য যুদ্ধ করেছেন সেটা বাদ দিয়ে হয়ত বাকশালে চলে এলেন, একনায়কত্বের ভূমিকা যে তিনি নিলেন, এটা একটা বিরাট ভুল করেছেন–সবাই বলে। আমিও তাই মনে করি। এ সম্বন্ধে আমি আলাপ করিনি, আমি বলেছিলাম, আমি কি করবো ? তিনি বললেন, আপনি একা কেন সবাই থাকবে আমার সাথে। কিন্তু বাকশাল কার্যকরী হলে কি হত পরে বুঝা যেত এখন তো বলা যায় না। তবে এটুকু বলা যায় যে তাঁর ধারণা ছিল সবাইকে দায়িত্ব দিয়ে সবার মতামত নিয়ে একটা কিছু করবেন। খারাপ উদ্দেশ্যে নিয়ে করেছেন বলে আমি মনে করি না।

জামাল উদ্দিন : কিছুদিন আগে ড. কামাল হোসেনের সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে তাঁর সাথে আলাপ হচ্ছিল বাকশাল সম্পর্কে, তিনি একটা কথা স্বীকার করলেন যে, তিনি কয়েকবার নাকি বঙ্গবন্ধুকে সরাসরি বলেছেন,'বাকশাল করা ঠিক হচ্ছে না' তারপর তিনি একপ্রকার মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দিয়ে বিদেশে চলে গেলেন, আপনার কোনো এ ধরনের ক্ষোভ ছিল কীনা ?

ডা. নুরুল ইসলাম : ড.কামাল হোসেন সাহেবদের সাথে হয়ত পলিটিক্যালি আলাপ করতে পারেন, আমার সাথে পলিটিক্যালি আলাপ করেন নি। আমার সাথে সরাসরি আলাপ করেছেন, পলিটিক্যালি আলাপ করেননি। তাঁর কথা আমি উপলব্দি করেছি। বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন এটাকে ডি-সেন্ট্রলাইজেশন করার জন্য। নিজের হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা রেখে সবকিছু করতে চেয়েছিলেন। বিশেষ করে, কমিউনিস্টরা তাঁকে মিস্‌গাইড করেছিলেন যে রাশিয়ার মতো সবকিছু করতে পারবেন। আমি মনেকরি এই কারণেই হয়তো বিপক্ষ গ্রুপ যেটা আমেরিকান গ্রুপ ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে শেষ করে দিল।

জামাল উদ্দিন : '৭৫ এর ১৫ আগষ্ট জাতীর জনকের নির্মম হত্যাকান্ড সম্পর্কে ....?

ডা. নুরুল ইসলাম : এক কথায় বেদনাদায়ক। বঙ্গবন্ধুকে আমার যতো কাছ থেকে

দেখবার সুযোগ হয়েছে তা খুব কম লোকের হয়ে থাকে। শুধু চিকিৎসক হিসেবে নয়-একজন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে। তাঁর সফর সঙ্গী হিসেবে। পরিবারে সম্পর্কের সবগুলো দিক থেকে এত গভীরভাবে, খুব ঘনিষ্টভাবে দেখবার আমার সুযোগ হয়েছে। তাঁকে দেখেছি শুধু একজন রোগী হিসেবে নয়-একজন প্রধানমন্ত্রী কিংবা রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে। বিদেশে সফর সঙ্গী হিসেবে। দৈনন্দিন জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁকে দেখবার সুযোগ হয়েছে। মানুষ হিসেবে জনগণের প্রতি তাঁর দরদ এবং যে ভালোবাসা তার তুলনা হয় না। তার একজন সিকিউরিটি অফিসার ছিল মহিউদ্দীন-বঙ্গবন্ধু তাকে দেখে একদিন বললেন, ও যখন আমার সামনে থেকে চলে গেল তখন বললেন, ডা. সাহেব ভালোবাসা দিয়ে কিভাবে মানুষের মন জয় করা যায় এটা উজ্জল দৃষ্টান্ত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মহীউদ্দীনের মার খায়নি এমন কোনো লোক নাই। বলতে গেলে এক কথায় সে একটা গুন্ডার মতো ছিল। সে মহীউদ্দীন এখন পরিবর্তন হয়ে গেছে আপনারা দেখেছেন? মহীউদ্দীনকে আমি ভালোবাসা দিয়ে সৎপথে এনেছি। মহীউদ্দীন এখনো আছে। মাঝখানে এম পি ছিল। আরেকজন ছিল মানিক। মানিক ছিল সিনিয়র, মহীউদ্দীন ছিল জুনিয়র। আর দুজন মানুষকে খুব ভালোবাসতেন, তারা ছিলেন গানের জগতের। একজন ছিলেন শিল্পী আব্দুল জব্বার এবং আব্দুল আলীম। আব্দুল জব্বারের মনে হয় শিক্ষা ছিল তবে আব্দুল আলীমকে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রী দিতে চেয়েছিলেন, যেহেতু আব্দুল আলীমের বেসিক শিক্ষা ছিল না। গ্রাজুয়েট না হলে কিংবা মাস্টার্স না হলে ডক্টরেট দেওয়া যায় না। জব্বারকে খুবই ভলোবাসতেন। তাকে কাছে এনে অনেক উপদেশ দিতেন, তিনি যে কাকে ভালোবাসতেন না সেটা বলা মুশকিল, কাকে ক্ষমা করেননি সেটা বলা মুশকিল। একবার আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বঙ্গবন্ধু আপনার সবচে বড় গুণ কি ? বললেন আমি দেশকে ভালোবাসি। বললাম, বড় দোষ কি ? বললেন আমি বেশী ভালোবাসি এটা আমার বড় দোষ।

জামাল উদ্দিন : বঙ্গবন্ধুর তো কাছের লোক ছিলেন আপনি। বঙ্গবন্ধুর কোনো ভুল ক্রটি অর্থাৎ বলতে চাচ্ছি বাকশাল প্রসঙ্গটা। এটা নিয়ে অনেকে কথা বলে আপনি তো খুব কাছেরজন এ প্রসঙ্গে কী আপনার সাথে কোনো আলাপ হয়েছে...?

ডা.নুরুল ইসলাম : বাকশাল সম্বন্ধে তখন কি হয়েছে ঠিক খেয়াল নেই। বেশীরভাগ সমস্যা বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আলাপ আলোচনা করতেন। তবে কিছুটা শুনেছি। পরে যখন দেখি বাকশালে আমার নাম দিয়েছে তখন মনে মনে একটু ইতস্তত করেছি।

আমি তো পলিটিক্স করতে চাইনা। তারপরও বলেছি যাব। দুয়েক জনকে জিজ্ঞেস করলাম ওদের একজন বলে যে আরো অনেকে আছে, সুফিয়া কামালসহ আরো অনেকে আছেন আমার এ মুহূর্তে ঠিক মনে পড়ছেনা। নাম করা কয়েকজন নির্দলীয় নিরপেক্ষ শিক্ষাবিদ আছেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর নুরুল ইসলামও ছিলেন। এঁদের নামগুলো দেখে তখন আমি বাকশালে গেলাম আর জয়েন করলাম।

বাকশাল জয়েন করার পরে সবাইকে রিসেপশান দিল সার্কিট হাউজে। বৃষ্টি পড়ছিল

স্ত্রী আনোয়ারা ইসলাম ও জননী প্রয়াত গুলমেহের বেগম এর সাথে জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম

তখন, তবু ভিজে ভিজে লোকজন বঙ্গবন্ধুর বিরাট বিরাট ছবি নিয়ে শ্লোগান দিচ্ছিল, আমি সেই প্রথম মিটিংয়ে গিয়েছিলাম। যেহেতু আমার রিসেপশান ছিল দশটায়-তখন পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিকেল অনুষদের আমি ডীন। সেদিন ছিল এক জরুরী সভা বাকশালের দায়িত্ব সত্বেও পূর্ব নির্ধারিত এ সভা আমি বাতিল করি নি আলোচনার জরুরী বিষয় ছিল তাই। মনে মনে স্থির করেছিলাম বাকশালের প্রথম সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে আসবো। সম্মেলন স্থানে আমার উপস্থিতির কিছুক্ষণ পরে বঙ্গবন্ধু এসে উপস্থিত হলেন। তিনি আমার দিকে তাকাতেই সালাম জানালাম। এরপর দোতলা থেকে সামনের রাস্তায় মিছিলের দিকে তাঁর নজর, আমি বসে ছিলাম দুয়েক সারি পিছনে। তার অগোচরে চলে আসা তাই সহজ ছিল। ভাবলাম, সালামের মাধ্যমে উপস্থিতি প্রমাণ করেছি, এরপর চলে যাওয়া অনেকটা নিরাপদ। কিছুক্ষণ মিছিল দেখার পর বের হয়ে আসার সময় পাশের রুমে দেখি স্বাস্থ্যমন্ত্রী মান্নান সাহেব বসে আছেন, ঢুকতেই তিনি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাচ্ছেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আমি বেরিয়ে আসছিলাম। মিটিংএর কথা তাকে জানালাম, বললাম আমাকে যেতে হবে। মিটিং জরুরী ছিল বলে বাতিল করিনি। মান্নান সাহেব বললেন আরে মশাই সেন্ট্রাল কমিটির মেম্বার হয়েছেন। রাখেন মিটিং-বসেন চা খান। একটু পর চা আসলো, খেতে শুরু করলাম, এমন সময় তিনি টয়লেটে গেলে সুযোগ পেয়ে আমি বেরিয়ে আসলাম। যা হোক নির্ধারিত সময়ে মিটিং শুরু করি।

এর কয়েকদিন পর বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে যখন আমার দেখাহয় তাঁকে বললাম স্যার একটা কথা বলবো, তখন কেউ ছিলনা তিনি আমি ছাড়া, বললাম স্যার এই যে সবাই আপনার ছবি

নিয়ে ঘোরাঘুরি করে। শ্লোগান দেয় এটা তো ঠিক না। তারপর বললাম, এই যে বিরাট বিরাট তোরণ বানায়, এগুলো তো সরকারী টাকার অপচয়, এ তোরণগুলো বন্ধ করান না কেন ? লোকে সমালোচনা করে বলে ওগুলো আওয়ামী লীগ নিজের টাকা দিয়ে করায়। লোকগুলোকে ভাড়া করে নিয়ে আসে। তখন তিনি বললেন, কী বললেন ডাক্তার সাহেব, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে দেখেননি, কি করে তারা ? দেখেছি স্যার। প্রত্যেককে মাও সে তুং এর ছবি বুকে লাগাতে ! কিন্তু ...। কিন্তু কি ? লোকজন যেখানে এগুলো করছে, আপনি বাধা দেবেন কি করে। তাদের সেন্টিমেন্টে কি লাগবে না ? স্যার, ডাক্তার হিসেবে তো অনেক ধরনের লোকের সাথে আমার আলাপ হয়। আপনাকে অনেকের সামনে না বললেও পেছনে বলেন। লোকে এগুলো সমালোচনা করে বলে, এগুলো বঙ্গবন্ধু নিজেই করায় এবং এদের নিয়ে এসেছেন, তিনি খানিকটা বিরক্তির সুরে বললেন, 'সমালোচনা করুক গে আমি বাধা দিতে পারবো না'। বললাম, স্যার আপনাকে বাধা দিতে হবে না, শুধু একটা বিবৃতি দেন খবরের কাগজে। বলেন, আমি ছবি চাই না কাজ চাই, তারপর তারা যা খুশি যা ইচ্ছে করুক। লোকজন বুঝবে আপনি চাননি। যা হচ্ছে তা আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই হচ্ছে। চুপ করে রইলেন বঙ্গবন্ধু। পরিশেষে তাঁর অসুস্থতা সম্বন্ধে ক'টি পরামর্শ দিয়ে বিদায় নিলাম। সাত্তার সাহেব তখন বঙ্গবন্ধুর সেক্রেটারী। নিচ তলায় বসেন। তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, সাত্তার সাহেব চাকরিটা থাকবে কিনা জানি না। কেন ? সাত্তার সাহেব জানতে চাইলেন। বঙ্গবন্ধুকে অনেক কথা বলে এসেছি। সেসব কথা সাত্তার সাহেবকে বললাম। রিয়েকশন কি কিছু বুঝতে পেরেছেন ? জানার জন্য সাত্তার সাহেবের কণ্ঠে ব্যাকুলতা। বললাম, প্রথমে রাগ, পরে একেবারে নির্বাক দেখলাম। সাত্তার সাহেব বললেন, ভালোই হলো ডাক্তার সাহেব এ নিয়ে বঙ্গবন্ধু নিশ্চয় চিন্তা করবেন, ভেবে দেখবেন। আপনি ভালোই করেছেন। ঠিক কয়েকদিন পরে বেতবুনিয়ায় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র উদ্বোধন, সেখানে কিন্তু একটিও তোরণ ছিল না। বুঝলাম উপদেশ দিলে তিনি চিন্তা করে সেটা গ্রহণ করতেন।

জামাল উদ্দিন : বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান কারাগার থেকে ফিরে এসে এক বিশাল সংবর্ধনায় স্বাধীনতা বিরোধী আলবদর রাজাকারদের সাধারণ ক্ষমা করেছিলেন, সেদিনের এই সাধারণ ক্ষমা কতোটুকু ঠিক ছিল বলে আপনি মনে করেন ?

ডা.নুরুল ইসলাম : এটা তিনি ভুল করেছেন। প্রত্যেক দেশে এরকম যুদ্ধবিরোধীদের শাস্তি হয়, আমাদের দেশে এটা না করে ভুল করেছেন বঙ্গবন্ধু।

জামাল উদ্দিন : বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধুর অবস্থানে, কিন্তু আজকে যেভাবে বঙ্গবন্ধুর পাশে জিয়াকে দাঁড় করানোর দূরভিসন্ধি চলছে, স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে স্টাবলিশ করা হচ্ছে, আপনি তো পুরো ইতিহাসের স্বাক্ষী আপনি বলুন না এটা কি হচ্ছে... ?

ডা. নুরুল ইসলাম : ২০০২ সালে দৈনিক জনকণ্ঠে জিয়াউর রহমান সাহেবের নিজের লেখা একটা আর্টিক্যাল ছাপা হয়েছে। সেখানে বঙ্গবন্ধুকে বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান

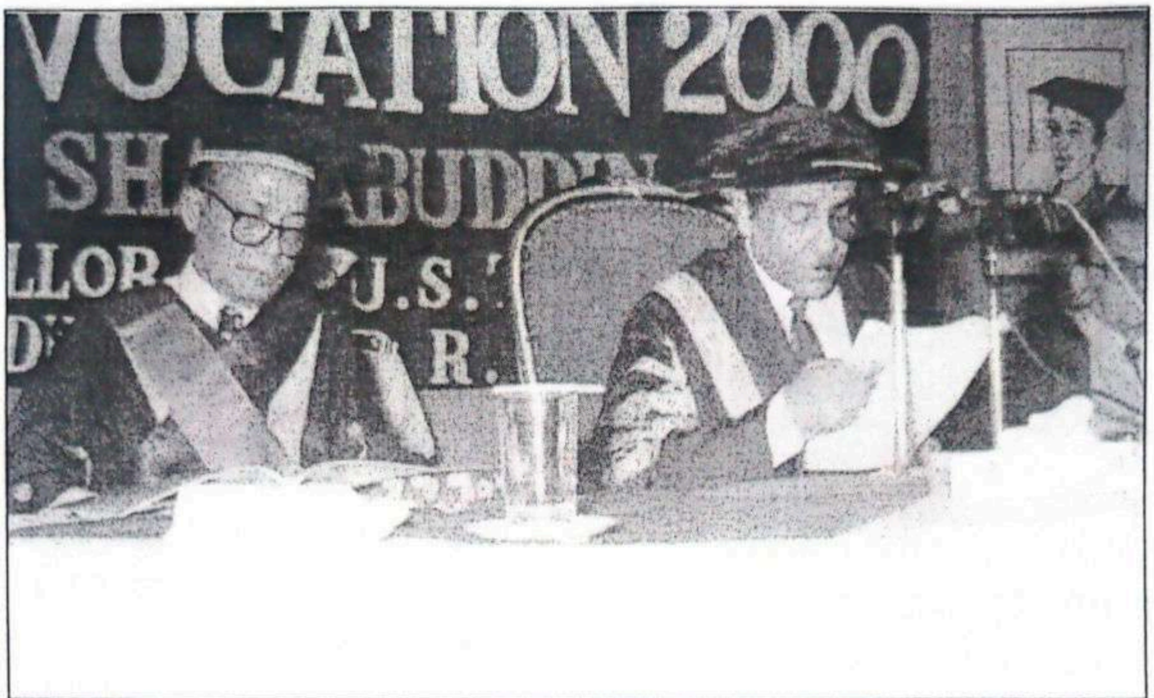

ইউএসটিসি'র প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের সাথে ইউএসটিসি'র প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম

জাতির জনক তিনি নিজেই লিখেছেন। আমি একটা আর্টিক্যাল লিখছি যে মুজিব-জিয়া বিতর্কের অবসান হোক। দু'জনকে এই যে স্বাধীনতার পদক দেওয়া হয়-এটা ঠিক হয়নি। এ বিষয়ে আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী একটা আর্টিক্যাল লিখেছিলেন, 'এ প্রহসন বন্ধ হোক'। এটা ঠিক হয়নি, মানে জিয়াউর রহমানকে তোলা এবং বঙ্গবন্ধুকে নামানো। জিয়া জীবিতকালে কোনোদিন এ প্রশ্ন ওঠেনি। কোথায় যেন পড়লামও ২৫ মার্চ জিয়াউর রহমান সাহেব স্বাধীনতার ঘোষণা করেছেন।

জামাল উদ্দিন : হ্যাঁ, এখন তো ওরা ২৭ মার্চ বাদ দিয়ে ২৫ মার্চ এ চলে আসলো-এখন এগুলো তো স্যার পাঠ্য পুস্তকে চলে আসছে। আপনারা তো ইতিহাসের স্বাক্ষী- আপনারা তো ইতিহাস, আপনারা চুপ করে আছেন কেন ?

ডা.নুরুল ইসলাম : চুপ করে নাই। এগুলো আমি লিখেছি আমার বইতে আছে। বিবিসিতে ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশ '৭১ আফসান চৌধুরীর লেখা প্রচারিত হয়েছে। জিয়াউর রহমান সাহেব নিজেই বলেছেন বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। এটাতো রেকর্ড আছে। সব জায়গায় রেকর্ড আছে।

জামাল উদ্দিন : আপনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন চিকিৎসক শুধু নন, আপনি ১৯৮৭ সালে জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে বিরল সম্মানে ভূষিত হলেন। আপনার এ সফলতা সম্পর্কে কিছু জানাবেন কি ?

ডা. নুরুল ইসলাম : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি সেক্রেটারি টেলিফোনে অনুরোধ জানালেন আমার সুদীর্ঘ জীবনবৃত্তান্ত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উক্ত মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে। পরদিন সকালবেলা পাঠিয়ে দিলাম। সময় লাগেনি, কারন সুদীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত– এ দু-ধরনের জীবন-বৃত্তান্ত সব সময় হাতের কাছে রাখি, প্রয়োজন অনুসারে যেন সরবরাহ

করতে পারি। নানা জায়গা থেকে এগুলোর একটা-না-একটার অনুরোধ আসে। নতুন কিছু সংযোজনের প্রয়োজন হলে তা সময়মতো করে রাখি যেন কিছু বাদ পড়ে না যায়। হঠাৎ কেন জীবনবৃত্তান্ত চাওয়া হল, স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা কৌতূহল জাগল। অবশ্য জানতাম, সব ধরনের জাতীয় পুরস্কার ও স্বীকৃতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে হয়ে থাকে। আন্দাজ করেছিলাম এমন একটা কিছু হবে। দিন কয়েক পর স্বাস্থ্যমন্ত্রী সালাউদ্দীন কাদের চৌধুরী কথায় কথায় বললেন, 'পোস্ট গ্রেজুয়েট ইনস্টিটিউটের পরিচালক হিসেবে সুদীর্ঘকাল বহু কিছু করেছেন। আপনাকে এখন জাতির বৃহত্তর স্বার্থে অনেক কিছু করতে হবে। আপনাদের মতো লোকের কাছ থেকে আমাদের প্রত্যাশা অনেক। জাতির কল্যাণে আপনাকে আরো অনেক কিছু দিতে হবে।' কথাগুলো সঠিক আন্দাজ করতে পারিনি তিনি কী বলতে চেয়েছেন। পরে একই মন্ত্রণালয়ের সূত্রে জানতে পারি আমাকে জাতীয় অধ্যাপক নিয়োগের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। এদিকে আমার চাকরির মেয়াদ আর মাত্র তিন মাস বাকি। ৩১ মার্চ অবসর গ্রহণের দিন।

জাতীয় অধ্যাপক নির্বাচনের একটি কমিটি আছে। কেবিনেটে উপ-প্রধানমন্ত্রী, যিনি বর্তমানে আপন ভুবনে নিঃসঙ্গ, তখন নিরুপায় ছিলেন। কারণ যে- কমিটি জাতীয় অধ্যাপক মনোনয়ন করেন, তাঁদের মধ্যে তিনি ছিলেন না। যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন অর্থমন্ত্রী সাইদুজ্জামান, বাণিজ্যমন্ত্রী মেজর জেনারেল এম.এ.মুনেম, সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী শামসুল হক এবং জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক। এঁরা সর্বসম্মতিক্রমে জাতীয় অধ্যাপক পদে নিযুক্তির জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে আমার নাম সুপারিশ করেন। বিশ্বস্থ সূত্রে এটা আমি জানতে পারি।

কিছুদিন আগে জাতীয় পর্যায়ে আমাকে একটা বিশেষ স্বীকৃতি দেবার ব্যাপারে অধ্যাপক মতিন ভিন্নমত পোষণ করেন, ফলে আমার নাম বাদ পড়ে।

আমি অবাক কিংবা হতাশ হইনি। মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম, সর্বসম্মতিক্রমে যে প্রস্তাব স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত হয়েছে এবং স্থায়ী নির্বাচনী কমিটিতে সর্বসম্মতিক্রমে যা অনুমোদিত হয়েছে, সেটা যদি কোনোক্রমে বানচাল হয় তাহলে কুচক্রী মহলের সব চক্রান্ত,চাকরি জীবনের নানা পর্যায়ে তাদের হীন আচরণ জনগণের সামনে তুলে ধরব। সাধারণ নিয়মানুসারে স্থায়ী কমিটির অনুমোদন লাভের কয়েকদিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি অনুমোদন দেন। সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয় এবং প্রকাশ করা হয়। আমার বেলায় কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা দিল। সুখবরের প্রত্যাশায় দিন গুনি। কিন্তু কোথাও-না-কোথাও বাধা। জানতে পারলাম আমার এককালীন ছাত্র উপ-প্রধানমন্ত্রী উঠেপড়ে লেগেছেন।

রাষ্ট্রপতি হিসেবে উপ-প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ের কেউ যদি তাঁকে কিছু বলে থাকেন সে- বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা কিংবা যাচাই করে দেখা নিতান্ত সমীচীন। তিনি তাই ব্যাপারটা তলিয়ে দেখেছিলেন এবং তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী মাহবুবুর রহমান একবার প্রস্তাবটি নিয়ে গেলে বিপক্ষে বা সপক্ষে মত না- দিয়ে স্থগিত রাখতে বলেছিলেন। শিক্ষামন্ত্রী পিছপা

ইউএসটিসিতে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম

হবার লোক নন। একবার যদি তিনি কোনো বিষয় বোঝেন, তার বিশ্বাসে ফাটল ধরানো সহজ ছিল না। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ যেমন ব্যাপারটা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, তেমনি আমার প্রতি তাঁর সহকর্মীর আচরণ তাঁর অজানা ছিল না। আমার মতবাদ, আদর্শ, নৈতিকতা এবং অন্যান্য কর্মকান্ড এক বিশেষ মুহূর্তে তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে তুলে ধরলে শিক্ষামন্ত্রীকে ডেকে নিয়ে ফাইলে অনুমোদন প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর এবং শিক্ষা মন্ত্রী মাহবুবুর রহমান প্রকৃত ঘটনা মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে তুলে না ধরলে সঠিক সিদ্ধান্ত হয়তো বাধাপ্রাপ্ত হত।

সকালবেলা ওয়ার্ডে রাউন্ড দিচ্ছি এমন সময় খবর এল মহামান্য রাষ্ট্রপতি কথা বলতে চান। তাড়াহুড়ো করে অফিসকক্ষে গিয়ে টেলিফোন ধরি। কুশল জিজ্ঞেস করে তিনি বললেন, 'আপনাকে জাতীয় অধ্যাপক নিয়োগ করতে চাই, অনেক কাজ করতে হবে।' আমি বললাম, 'সুযোগ পেলে কাজের ইচ্ছা আছে। এটাকে আমি আল্লাহ্‌র রহমত এবং আপনার শুভেচ্ছা বলে মেনে নেব স্যার।' তিনি বললেন, 'আমি জানি অনেক কিছু করার আপনার ক্ষমতা আছে আপনি পারবেন। আমার শুভেচ্ছা রইল।' জবাবে বললাম, 'দোয়া করবেন স্যার।' 'নিশ্চয়ই।' টেলিফোন ছাড়ার সাথে সাথে মনে মনে পরম করুণাময়ের কাছে শোকরিয়া আদায় করলাম।

একই সন্ধ্যাবেলা তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী মাহবুবুর রহমান টেলিফোন অভিনন্দন জানিয়ে সতর্কিত করলেন যে রাতে গণমাধ্যমে ঘোষণা না-হওয়া পর্যন্ত সবকিছু যেন গোপন থাকে। স্ত্রী আনোয়ারা ও মাকে ছাড়া কথাটি কাউকে বলিনি। রাতে রেডিও এবং টেলিভিশন মারফত ঘোষণা দেয়া হল আমি জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত। পরদিন

অফিসে গিয়ে টেলিফোনে একের পর এক অভিনন্দন পেতে লাগলাম। অফিসে ভিড়। এঁদের কেউ কেউ মনের অবস্থা চেহারায় ঢাকা দিতে পারেননি। যে-ব্যক্তি বলেছিলেন ঐ প্রস্তাব কার্যকরী হবেনা, তাঁকেও দেখলাম। পরে এ ব্যক্তিই বলতে লাগলেন পরিচালকের মেয়াদ শেষে আমি ওখানে থাকতে পারব না; অন্য কোথাও, হয়তোবা বি.এম.আর.সি.-তে অফিস করতে হবে।

আমার যুগ্ম পরিচালক ডা. মোহাম্মদ তাহের এবং সুপারের সাথে আলোচনা করে ঠিক করলাম লাইব্রেরির পূর্বপাশে খালি জায়গায় আমার অফিস করলে গবেষণার কাজকর্মে সুবিধে হবে। নতুন পরিচালকের কাজের ব্যাঘাত হবে না। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ চালিয়ে যেতে থাকলাম। এ অফিসে বসেই 'আধুনিক' (আমরা ধুমপান নিবারণ করি)-এর জন্ম। ছাত্ররা এসে অনুরোধ জানালেন তাঁদের ক্লাস নিতে। নিয়মানুসারে ভারপ্রাপ্ত পরিচালক টি.এ. চৌধুরীর অনুমতি নিতে বললাম। তাঁরা আর ফিরে এলেন না। পরে জানতে পারলাম তিনি মত দেননি। অফিসের নানাদিকে তিনি বাধা সৃষ্টি করতে লাগলেন। অথচ জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে আমি যে-কোনো প্রতিষ্ঠানে কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারব এবং তার জন্য সব সুযোগ-সুবিধে সে প্রতিষ্ঠান দেবে, এমন শর্ত ছিল। জাতীয় অধ্যাপক (ডা.) মোহাম্মদ ইব্রাহীম তাঁর পছন্দ মতো বেছে নিয়েছিলেন বারডেম, জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক নিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; আর আমি নিয়েছিলাম আই.পি.জিএম. আর -কে। আমার হাতে যে পি.জি.র জন্ম।

আমার বিশেষ সুপারিশে যাঁরা সেখানে নিয়োগপত্র পেয়েছেন তাঁরাই হয়ে গেলেন পর। অন্যায়ভাবে যে-ব্যক্তিকে তাঁর বিভাগে প্রধান হিসেবে স্বীকার করিনি, অধ্যাপক রশীদের প্রাধান্য মেনে নিতে তাঁর যে সহযোগী পারেননি, তাঁকেই নেতৃত্ব দিতে দেখা গেল আমার বিরুদ্ধে গোপন আন্দোলনে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত সালাউদ্দীন কাদের চৌধুরীকে দলে টানতে না পেরে, স্বাস্থ্য সচিবকে দিয়ে অন্যায় আবদার রক্ষা করতে না পেরে, ব্যক্তিটি ওঁত পেতে ছিলেন। মন্ত্রী মহোদয় যখন বিদেশে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডা.মতিনের নির্দেশে নির্বাক-হওয়া অসহায় পুলিশকে সামনে রেখে চতুর্থশ্রেণীর যে কর্মচারীকে এক সন্ধ্যাবেলা তিনি হঠাৎ আমার অফিস কক্ষ তছনছ করে দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সে-ই আমাকে টেলিফোনে জানাল যেন পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করি। আমি বললাম, আমার কিছুই করা ঠিক হবে না। কিছুক্ষণের মধ্যে খবর এল ঘর ভাঙা শুরু হয়েছে ডা. আহসান উল্লার নেতৃত্বে। ঐ সময় বাইরে একটা বিশেষ গাড়ি দেখা গিয়েছিল। পরের দিন সব পত্রিকায় এ খবর প্রকাশিত হয়।

জামাল উদ্দিন : আপনার নেতৃত্ব সেই ১৯৫৮ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যক্ষ্মার প্রকোপ থেকে জাতিকে বাঁচাতে জাতীয় যক্ষ্মা সমিতি গঠিত হয়। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি গঠনে আপনার অসাধারণ নেতৃত্ব এবং ভূমিকা সম্পর্কে কিছু বলবেন কি ?

ডা. নুরুল ইসলাম : ১৯৫৭ সালের শেষের দিকে কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে ঘরোয়া

আধুনিক, জাতীয় ঔষধনীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

জাতীয় যক্ষ্মা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর নুরুল ইসলাম। ১৯৫৮ সালে এই সমিতির স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন তিনি। এই আন্দোলনটি সারা দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে, জনগণ যক্ষ্মা প্রতিরোধে সচেতনতা লাভ করে।

জাতীয় ঔষধনীতির প্রণেতাও হলেন তিনি। ১৯৬৮ সালে অপ্রয়োজনীয় ঔষধ নিষিদ্ধ ও আমদানী নিষিদ্ধ কার্যক্রম নিয়ে এগুতে থাকে এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম। শেষ পর্যন্ত তাঁরই নেতৃত্বে ১৯৯৮ সালে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় প্রণীত একটি শক্তিশালী জনকল্যাণমুখী ঔষধনীতি বাস্তবে রূপলাভ করে।

আধূনিক প্রফেসর নুরুল ইসলাম এর আরেকটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। ধূমপান নিবারণে এই আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এবং দেশ বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

আলোচনায় মিলিত হলাম। আলোচনায় শামিল হয়েছিলেন বন্ধুবর ডা. শেখ আবদুস সোবহান, ডা. মোবারক হোসেন, মরহুম ডা. টি. আহমেদ ও আরো কয়েকজন। সাব্যস্ত করলাম যক্ষ্মা প্রকোপ থেকে দেশকে বাঁচাতে হলে একটা সমিতির প্রয়োজন অপরিহার্য। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ শ্রদ্ধেয় জনাব আতাউর রহমানের নেতৃত্বে একটি সমিতি গঠন করা হল। তিনি সভাপতি নির্বাচিত হলেন, আমি হলাম সাধারণ সম্পাদক। পুরনো ঢাকা মিউজিয়ামের পার্শ্ববর্তী রেলক্রসিং-সংলগ্ন বর্তমান যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের পাশে খোলা জায়গায় প্রথম আনুষ্ঠানিক সভা হল। সমিতির উদ্দেশ্য, ভবিষ্যৎ কার্যক্রম, সামাজিক দায়িত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন দিকের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমি আমার বক্তব্য রাখলাম। শ্রদ্ধেয় আতাউর রহমান সাহেব সময়োচিত উদ্যোগের জন্য আমাদের অভিনন্দন জানালেন, উৎসাহ দিলেন এবং বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

১৯৫৮ সাল। সালটি নিঃসন্দেহে পূর্ব পাকিস্তান যক্ষ্মা সমিতির ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। জীবনে সাংবাদিক সম্মেলনের সম্মুখীন হবার প্রথম সুযোগ হল। সম্মেলনটি আয়োজন করা হয়েছিল প্রেসক্লাবে। যক্ষ্মা সম্বন্ধে কোনো বিজ্ঞানসম্মত জরিপ কখনো চালানো হয়নি। তাই এর ওপর নির্ভরযোগ্য তথ্য পাবার সুযোগ ছিল না। বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত কিছু খবরা-খবরের মাধ্যমে হিসেব করে দেখেছিলাম শুধু পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিবছর কমপক্ষে ৯০,০০০ লোক যক্ষ্মা রোগে অকালে প্রাণ হারায়। এছাড়া আরো অনেক প্রশ্নের উত্তর দিলাম। পরদিন প্রত্যেকটি দৈনিক কাগজে প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফে প্রথম খবর হিসেবে ছাপানো হয়েছিল এ ভয়াবহ তথ্য। চারদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল। একের পর এক প্রতিটি দৈনিক এবং বেশ কয়েকটি সাপ্তাহিকে সম্পাদকীয় লেখা হল।

শ্রদ্ধেয় জাকির হোসেন সাহেব তখন পূর্ব
পাকিস্তানের গভর্ণর। সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটিতে আলোচনা করে ঠিক করলাম যে তাঁকে পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আমাদের আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য অনুরোধ করা হবে। যথারীতি অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দেয়া হয়। কিছুদিন পর আমাদের জানানো হল তিনি

বাংলাদেশের চার জন জাতীয় অধ্যাপক (ডান দিক থেকে) প্রফেসর আবদুর রাজ্জাক, শামসুল হক, সৈয়দ আলী আহসান ও ডা. নুরুল ইসলাম

রাজি হয়েছেন। সানন্দে সে শুভ সংবাদ আমরা গ্রহণ করলাম। একদিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে সমিতির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁকে অবহিত করলাম। আন্দোলনটি সারাদেশ জুড়ে গড়তে পারলে কী সুবিধে হতে পারে তাও জানালাম। তিনি প্রত্যেক ডি.সি-র কাছে ডি.ও লিখলেন। নির্দেশ দিলেন যাতে করে অবিলম্বে প্রত্যেক জেলায় যক্ষ্মা সমিতি গড়ে ওঠে।

জামাল উদ্দিন : আপনার খুবই সাহসি পদক্ষেপ জাতীয় ঔষধ নীতি প্রণয়ন। এই দুঃসাহসিক কাজ কিভাবে সম্ভব করলেন একটু খোলাখুলি বলুন–

ডা. নুরুল ইসলাম : বিদেশে উচ্চ শিক্ষা লাভের পর দেশে ফিরে দেখি চিকিৎসা জগতে নানা বিশৃঙ্খলা। ওষুধের যথেচ্ছ ব্যবহার ছিল সবচেয়ে প্রকট। প্রেসক্রিপশনে একই রোগের একাধিক ওষুধ। টনিক নামধারী ওষুধের প্রচুর ব্যবহার। কোরামিন, ক্যালশিয়াম, নার্ভটনিক, এ সবগুলোই ছিল অনেক জটিল রোগের চিকিৎসার উপাদান। নিজেকে সামলাতে পারিনি। পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করি। অনেক কোম্পানিকে তাদের কয়েকটি উৎপাদনের নাম দিয়ে সরাসরি লিখে পাঠালাম এগুলোকে ওষুধ বলা যায় না। কারণ, শুধু রোগীদের অর্থের অপচয় ছাড়া এগুলোতে কোনো কাজ হয় না। দু-একটা কোম্পানি আপত্তি জানাল। এমনকি কেউ কেউ ভয় দেখাল কোর্টে গিয়ে আমাকে নাজেহাল করবে, আমি কেন তাদের ওষুধের নামে দুর্নাম রটাচ্ছি। আমি সদ্য বিলাত-ফেরত ডাক্তার, উৎসাহের জোয়ার, ভয়ের লেশমাত্র নেই। বিরক্তির সুরে বললাম, তারা কোর্টে গেলে বরং ভালোই হবে। লোক জানবে কত ওষুধ 'ওষুধ' নামের অযোগ্য। শুধু মানুষ ঠকানোর হাতিয়ার। আমার হেরে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। শেষপর্যন্ত কোর্টের আশ্রয় কেউ নেয়নি। বিভিন্ন সাময়িকীতে ওষুধ নিয়ে এরপর আরো কয়েকটি প্রবন্ধ

প্রকাশ করি।

১৯৬৮ সালে জাতীয় বিজ্ঞান সম্মেলনের মেডিকেল সেকশনের চেয়ারম্যান হিসেবে আমার বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'সেনসিবল প্রেসক্রাইবিং'। বহুল ব্যবহৃত ওষুধের ওপর আলোচনামূলক এই প্রবন্ধ বিপুল উৎসাহের সৃষ্টি করে। এ সময় একদল চিকিৎসক ও সমাজকর্মী একই ভাবধারা নিয়ে এগিয়ে আসেন। ১৯৭০-'৭১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ঔষধের সমস্যা নিয়ে আওয়ামী লীগ-প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সাথে আমার আলোচনা করার সুযোগ হয়।

পাকিস্তানি আমলে ঔষধ প্রশাসন মোটামুটিভাবে কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে ছিল কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীন একজন অতিরিক্ত পরিচালক। প্রাদেশিক সরকারের ডাইরেক্টর অব হেলথ সার্ভিসের অধীনে একজন লাইসেন্সিং অফিসার ছিল। দেশ বিভাগের পূর্বে ঔষধের শতকরা ষাট থেকে সত্তর ভাগ আসত পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। সেখানে ছিল অনেক ঔষধ তৈরির কারখানা। স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশে ঔষধ-সঙ্কট বিরাট আকারে দেখা দেয়। এর মোকাবেলার দায়িত্বে ছিল টি.সি.বি। এ কর্পোরেশন ওষুধ আমদানি করতে শুরু করে এবং বিদেশ থেকে দান হিসেবে অনেক ঔষধ গ্রহণ করে। প্রশাসনিক কাঠামো এবং বিশেষজ্ঞের অভাবে অবশেষে অনেক অপ্রয়োজনীয় ঔষধ দেশে এলেও প্রয়োজনীয় অনেক ঔষধের অভাব দেখা গেল।

স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার অবস্থা উপলব্ধি করে ১৯৭৩ সালের ১০ জুলাই সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেন। চেয়ারম্যানের দায়িত্ব আমার ওপর অর্পিত হয। ঔষধ আমদানির ক্ষেত্রে এ কমিটির সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত। টি.সি.বি. মনে করল এটা তাদের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ। তাদের অসহযোগিতায় বাধ্য হয়ে আলী আশরাফ ও এম.এ. কাদেরীকে নিয়ে আমি ১৯৭৩ সালের ১৪ জুলাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করি। সেদিন তিনি সুস্পষ্ট নির্দেশ দেন যে বিশেষজ্ঞ কমিটি টি.সি.বি. কর্তৃক আমদানিকৃত ঔষধের মান এবং পরিমাণ উভয়ই নির্ধারণ করবে।

যেখানে টেন্ডার চাওয়া হয়েছে, বিশেষজ্ঞ কমিটি সেগুলো যাচাই করে সুপারিশ পেশ করবে।

কমিটি প্রয়োজনবোধে বিশেষজ্ঞ কো-অপারেট করতে পারবে।

কমিটি এমনকি আমদানিকৃত ঔষধের মূল্যও পুনঃনির্ধারণ করতে পারবে।

এ আদেশ বলে কমিটি অনেক ঔষধ বাতিল করে। মাদক-মিশ্রিত অনেক টনিকও এমন ভাবে বাদ পড়ে। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী মহল এতে তৎপর হয়ে ওঠে এবং বিশেষজ্ঞ কমিটির বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালরাত্রিতে ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে এদেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়। এ সুযোগ স্বার্থান্বেষী ব্যবসাযী মহলের প্ররোচনায় কমিটি থেকে আমাকে বাদ দেয়া হয়। আমার পরিবর্তে এমন একজনকে

চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয় যার টনিক, হজমী ইত্যাদির প্রতি অগাধ বিশ্বাস ছিল। ফলে দেশে আমার নেতৃত্বে যেসব ঔষধ বাতিল হয়েছিল সেগুলো আবার বাজার দখল করে। ১৯৮২ সালে আবার রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হল। লে. জেনারেল এইচ.এম.এরশাদের নেতৃত্বাধীন সামরিক সরকার ক্ষমতায় আসে। ক্ষমতা গ্রহণের কিছু দিনের মধ্যে ২৭ এপ্রিল, ১৯৮২ তিনি নতুন বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেন। এবারও সে-কমিটির চেয়ারম্যান হবার সুযোগ লাভ করি। আমার নেতৃত্বে গঠিত কমিটির সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে তিনি ঔষধ অধ্যাদেশ জারি করেন ১২ জুন, ১৯৮২ সালে। আমাদের ওষুধ নীতি সারাবিশ্বে এক নজিরবিহীন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ঔষধ নীতিকে অনেকে আখ্যায়িত করেছেন 'সাহসী পদক্ষেপ'। কেউ বলেছেন, 'সবচেয়ে প্রয়োজনীয়।' কারো কারো মতে, 'গৌরবময় দৃষ্টান্ত এবং ঔষধ নীতির ইতিহাসে সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা।' আবার অনেকেই বলেছেন, 'বাংলাদেশের ঔষধ নীতি হচ্ছে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রণীত অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ-তালিকার একটা বাস্তব ও কল্যাণমুখী প্রয়োগ।' বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তি, সমাজকর্মী, রাজনৈতিক নেতা, এমনকি বিশ্বের ধর্মীয় নেতারাও এ ঔষধ নীতিকে স্বাগত জানিয়েছেন।

আমাদের ঔষধ নীতিই আজ সাহসিকতার সাথে জাতীয় অগ্রগতির সুসংবাদ সর্বত্র বয়ে নিয়ে যেতে পারে। বস্তুত এ নীতি বাংলাদেশকে এক ঐতিহাসিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে।

রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় প্রণীত একটি শক্তিশালী জনকল্যাণমুখী ঔষধ নীতি যে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে, নিঃসন্দেহে বাংলাদেশে এরশাদ সরকার তা প্রমাণ করতে পেরেছেন।

এ নীতির সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত জড়িত থাকা আমার পক্ষে সুখের, গৌরবের।

শরীফা বুলবুল : যক্ষ্মা সমিতি, জাতীয় ঔষধ নীতি, আপনিই প্রতিষ্ঠা করেছেন। এরপর আরেকটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ আমরা ধূমপান নিবারণ করি, সংক্ষেপে 'আধূনিক'। আপনার শ্লোগান ধূমপান বিষপান, এ দু'টো শব্দ পুরো জাতিকে নাড়া দিয়েছে, এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

ডা. নুরুল ইসলাম : ১৯৪৫ সাল। কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র হিসেবে আমি আমার এক ধূমপায়ী বন্ধুর সান্নিধ্যে এসে ক্রমে ক্রমে ধূমপানের বদ অভ্যাসের শিকার হই। এ নেশা ক্রমাগতই বাড়তে থাকে। পরিস্কার মনে পড়ে এ বদ অভ্যাসের নানা ধাপের কথা। প্রথমে অন্য কারো থেকে সিগারেট গ্রহণ করি সৌজন্যমূলক উপহার হিসেবে। দ্বিতীয় ধাপে না-কিনে কারো কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে ধূমপান শুরু করি। তৃতীয় ধাপে সিগারেট কিনি একটা-দুটো করে। চতুর্থ কিংবা শেষ ধাপে প্যাকেট-ভর্তি সিগারেট কিনে নিজে খাই এবং অন্যদেরও খেতে দিই। সে যদি ধূমপায়ী হয়, হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিয়ে ধন্যবাদ জানায়। আর যদি অধূমপায়ী হয়, বিনীতভাবে ফিরিয়ে দিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলে 'ধন্যবাদ'। এরপরও রেহাই নেই। তাকে বোঝানোর চেষ্টা করি ধূমপানের

বাম থেকে, ভাবী মোস্তফা, ভাগ্নে ঢাকাস্থ সেন্ট্রাল হাসপাতাল এর ডাইরেক্টর ডাঃ এম এ কাসেম, মা, বড় বোন মাসুদা; পেছনে ভাগ্নি রোকেয়া, আখতার, ভাগ্নি নীলু, মেয়ে নীনা ও ভাইপো আবুল কালাম।

সুফল। বলি একবার খেয়ে দেখা উচিত। কেননা ধূমপানের অনেক গুণ আছে। ধূমপানের প্রথম থেকে চতুর্থ ধাপে পৌছাতে আমার প্রায় এক বছরের মতো সময় লেগেছিল। এ অভ্যাস আমার চলতেই থাকে। শেষপর্যন্ত এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌছি, কোনো-না-কোনো কারণে সিগারেট না-পেলে নিজেকে অসহায় মনে করতাম। ব্যাপারটা ব্যক্তিগত হলেও প্রত্যেক ধূমপায়ীর বেলায় প্রযোজ্য। এমনি করে এ মারাত্মক বদঅভ্যাসের শিকার প্রতিটি ধূমপায়ী।

গ্রামে-গঞ্জে অবশ্য ধূমপানের অভ্যাস জন্মায় কিছুটা ভিন্নরূপে, ভিন্ন-গতিতে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধূমপায়ী গৃহকর্তা এখানে প্রধান নায়ক। গৃহকর্ত্রী কিংবা ছেলেমেয়ের কাজ তামাক সাজানো। তারপর হুঁকোয় কয়েকটা টান দিয়ে পুরোপুরি তৈরি করে একে বড় সাহেবের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। গৃহকর্তা যেমন এ-কাজটিকে অন্যদের দায়িত্ব বলে মনে করেন, তেমনি অন্যরাও এটাকে সামাজিক বা পারিবারিক সাধারণ রীতি হিসেবে ধরে নেয়। এমনি করে প্রতিদিনের তামাকের টান প্রথমে গুরুজনের দায়িত্ব পালন হিসেবে শুরু হলেও প্রতি টানের নিকোটিন ধীরে ধীরে সকলের অজান্তে আসক্তির সৃষ্টি করে। তাই দেখা যায় গৃহকর্তা যেখানে ধূমপায়ী, পরিবারে অনেকেই সেখানে তাঁর অনুসারী। গ্রামে-গঞ্জে ধূমপানের এ প্রভাব আপাতদৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও মূলত ভিন্নস্তরে ধূমপানের বদঅভ্যাস কীভাবে বিস্তৃতি লাভ করে তা হচ্ছে-

যে ধূমপান ১৯৪৫ সনে আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে, যে ধূমপানকে আমি ব্যক্তিত্বের বিকাশ হিসেবে, বিপদমুক্ত একটা সবল অভ্যাস হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম, তার প্রতি প্রথম আঘাত আসে পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি। এ সময় বিলাতে

মায়ের ডানে স্নেহপরায়ণ বড়ভাবী মোছাম্মৎ মোস্তফা খানম বামে স্ত্রী আনোয়ারা ইসলাম, পেছনে বাল্যবন্ধু এবং পরবর্তীতে ভাইঝি জামাই অধ্যাপক ডা. আবদুল অদুদ এর মাঝে জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম।

তামাকবিরোধী আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। বিভিন্ন সাময়িকীতে তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। তবুও এই বিষপানের প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে আমার সময় লাগে প্রায় এক যুগের মতো। ১৯৬৩ সালে দ্বিতীয়বার বিলাতে অবস্থানকালে আমি এ ধূমপান তথা বিষপানের বিসর্জন দিই। এককালে প্রবল ইচ্ছা থাকলেও এ নেশাকে বিসর্জন দেয়া সম্ভব ছিল না। এখন এ বিসর্জনের সুফল প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি।

ধূমপান বিসর্জনের বৈজ্ঞানিক এবং স্বাস্থ্যগত কারণ এখন অনেকেরই জানা। তবুও ধূমপানজনিত কারণে অনেক অসহায় এমনকি দুরারোগ্য রোগীদের করুণ পরিণতি এ সর্বনাশা বদ অভ্যাস থেকে আমাদের নিস্কৃতি লাভের কতটা সহায়ক তা ভেবে দেখার মতো। জনগণকে যদি সঠিক সময়ে সচেতন করে তোলা না-যায় তার পরিণতি হয় ভয়াবহ। উন্নয়নশীল দেশে এ অশুভ লক্ষণ এখন বৃদ্ধির দিকে। জনগণকে সচেতন করে তোলার উদ্দেশ্যে মাঝে মধ্যে পত্রপত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করি। সাংগঠনিক পর্যায়ে কিছু করার চিন্তাভাবনা নিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবের সাথে আলোচনা করি। প্রথমে ভাবলাম ধূমপান বিরোধী একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলব এবং এজন্য এর নাম ঠিক করতে হবে। সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্র এবং কিছু প্রতিষ্ঠাতা সদস্য খুঁজে নিতে হবে। ধূমপান বিরোধী প্রতিষ্ঠান নিয়ে বিভিন্ন নামের প্রস্তাব আছে। সিদ্ধান্ত না-নিয়ে নামগুলো একের পর এক লিখে রাখি।

কয়েকদিন পর খাবার টেবিলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মোহাম্মদ আলী, তাঁর স্ত্রী

খালেদা হানুম, আমার সহধর্মিণী আনোয়ারা বেগম (যার অনুপ্রেরণায় আমি ধূমপান বিসর্জন দিই) ডাক্তার আবদুল ওয়াদুদ এবং ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. সিরাজুল করিমের সাথে প্রতিষ্ঠানের নামকরণ নিয়ে আলোচনায় বসি। আমার সহধর্মিণী ও খালেদা হানুম প্রস্তাব দিল বাংলায় নাম হলে ভালো হবে। এ প্রস্তাব আমার কাছে মোটেও অপ্রত্যাশিত ছিল না। খালেদা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার সহযোগী অধ্যাপিকা। আমার স্ত্রী তার নিকট-আত্মীয়াকে সমর্থন দেবে এটা স্বাভাবিক। প্রস্তাবটা যুক্তিসঙ্গত মনে করে চিন্তা ভাবনা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ চিন্তা ভাবনার পর সমাধান খুঁজে পেলাম। প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের নাম 'আধূনিক'-এর এমনি করে খাবার টেবিলে জন্ম। এ 'আধূনিক'-এর সাথে প্রচলিত আধুনিকের দ্বন্দ্ব বেশ কিছু দিন ধরে চলতে থাকে। খবরের কাগজের পাতায় ভুল ছাপানো হয়। ভুলটা আমরা টেলিফোনে জানিয়ে দিই। আবার সে ভুল। শেষ পর্যন্ত জানা গেল গলদ কোথায়। সম্পাদক 'আধূনিক'-কে শুদ্ধ করে 'আধুনিক' লিখে দেন। কিন্তু কম্পোজিটর যে আধুনিকের সাথে পরিচিত আমাদের আধূনিক যে সে-আধুনিক নয়, 'আমরা ধূমপান নিবারণ করি' শব্দগুলোর প্রথম অক্ষর নিয়ে যার উৎপত্তি, তা তার জানা নেই। 'আধূনিক' নাম আবিষ্কারের মাসখানেকের মধ্যে গঠনতন্ত্র প্রণীত হয়। প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য হিসেবে ১৭ জনকে নিয়ে প্রথম কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়। আমাকে সভাপতি এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক এনায়েতউল্লাহ খানকে মহাসচিব মনোনীত করে কমিটি গঠন করা হয়। এবার সমাজকল্যাণ বিভাগে রেজিস্ট্রেশন করার পালা। নুরুল ইসলাম খান সাহেবের সাহায্য এবং সহানুভূতি না পেলে জানি না এ কাজে কত সময় লাগত। তবে অল্প সময়ে এ-কাজ সম্পন্ন করে আমরা সুষ্টুভাবে এগিয়ে যেতে পেরেছিলাম বলে হয়তোবা আধূনিকের বর্তমান অবস্থানে আমরা আসতে পেরেছি।

১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রেজিস্টার্ড করা প্রতিষ্ঠান আজ শুধু একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান নয়, দেশের আনাচে-কানাচে উচ্চারিত একটি নাম। দেশের প্রতিটি জেলায় আধূনিকের শাখা এখন প্রতিষ্ঠিত। ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিলেট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে এর ছাত্রসংগঠন গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহে 'আধূনিক'-এর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা গঠিত হয়েছে। শুধু তা নয়, বেশ কিছু সংখ্যক উপজেলায়ও আধূনিকের শাখা প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে সারা দেশে আধূনিকের সংখ্যা ৭৮। আমার দেয়া স্লোগান 'ধূমপানে বিষপান' এখন আধূনিকের স্লোগান হিসেবে বাংলাদেশের শহরে, গ্রামে, গঞ্জে, সবখানে অনেকের মুখে মুখে।

জামাল উদ্দিন : ১৯৮৯ সালে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইউ.এস.টি.সি'র যাত্রা শুরু করলেন । যতটুকু জানি, যাত্রা শুরু থেকে এই প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে একটি কুচক্রী মহল কর্তৃক নানা বাধা বিপত্তি সহ প্রতিষ্ঠানটি- অংকুরেই বন্ধ করে দেয়ার পায়তারা শুরু করেছিল। এই সংকট কাটিয়ে উঠতে আপনাকে অশেষ কষ্ট ও ধৈর্যের সম্মুখিন হতে হয়েছে। এই সংকটকালে আপনার পক্ষে ও বিপক্ষে অনেকের ভূমিকা

ইউ.এস.টি.সি প্রতিষ্ঠা

১৯৮৯ সালের ১৩ মে মাত্র ৪০ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইউ.এস.টি.সি'র যাত্রা শুরু। জাতীয় অধ্যাপক প্রফেসর ডা. নুরুল ইসলাম এর স্বপ্ন-ইউ.এস.টি.সি'র সূচনালগ্নের সম্বল ছিল মাত্র দুটো টিনসেড ঘর। ৪০ জন ছাত্রের ক্লাসার বেঞ্চ, শিক্ষকদের জন্য একটি টেবিল, চেয়ার ব্লাকবোর্ড, আশেপাশে জঙ্গল, জনশূন্য রাতের অন্ধকার। সেদিন তিনি বলেছিলেন, এই প্রতিষ্ঠান টিকে থাকবে, প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রগাঢ় আত্মবিশ্বাস এবং অতীতের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে তিনি বললেন–ঢাকা মেডিকেল কলেজ, পিজি হাসপাতালের যাত্রাও টিনসেড থেকে। পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট চালু হয় টিনসেড থেকে। এসব প্রতিষ্ঠানও ছিল তাঁর নিজ হাতে গড়া। টিনসেড দিয়ে শুরু ইউ.এস.টি.সি'র আজ বিশাল পরিধি। যার সুনাম আজ দেশ ও বহির্বিশ্বে।

ছিল। অর্থাৎ আমরা জানতে চাচ্ছি ইউ.এস.টি.সি'র প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে প্রতিষ্ঠালগ্নের সেসব ইতিহাস...

ডা. নুরুল ইসলাম : ১৯৮৯ সালের ১৩ই মে মাত্র ৪০ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে আইএএইচএস-এর অগ্রযাত্রা। সম্বল ছিল দুটো টিনসেড। ৪০ জন ছাত্রছাত্রীর বসবার উপযোগী বেঞ্চি। শিক্ষকদের জন্য একটি টেবিল চেয়ার, ব্ল্যাকবোর্ড এবং আনোয়ারা-নুর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট প্রদত্ত একটি ওভারহেড প্রজেক্টর, আশেপাশে জঙ্গল, অবহেলিত, জনশূন্য রাতের অন্ধকার।

ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে প্রথম দিনের বক্তৃতায় বলেছিলাম,

"আমাদের অবস্থান দেখে ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই হয়তো নিরুৎসাহিত হবে। কেউ কেউ মা-বাবাকে দোষারোপ করে বলবে ভবিষ্যতে কি হবে ? আমি বলব, তোমরা সকলেই ভাগ্যবান। ভাগ্যবান এখানে প্রথম হওয়ার সুযোগ। যে আইএএইচএস আজ প্রতিষ্ঠিত তা টিকে থাকবে, সম্প্রসারিত হবে। আজকে যারা ভর্তি হয়েছ তারা সবসময় পরিচিত হবে ইউএসটিসি-এর প্রথম ব্যাচের ছাত্রছাত্রী হিসেবে। এই প্রথম হওয়ার সুযোগ আর কারো জীবনে আসবে না, আসতে পারে না। এটি হবে সবার জন্য গর্বের এবং গৌরবের।"

আমার কথাগুলো অনেকের হয়তো মনে হয়েছিল আবেগপূর্ন, কল্পনাপ্রসূত। এই ব্যাচের ছাত্র পাস করে প্রস্থান হওয়ার পর ইন্টার্ণী ট্রেনিং-এর সময় অনেকেই স্বীকার করে শুরুতে তারা হতাশ হয়েছিল। কেউ কেউ মা-বাবাকে দোষারোপ করেছিল। অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের অভয় দিয়েছিল, ড. নুরুল ইসলাম যে উদ্যোগ নিয়েছেন তা সফল হবেই, তিনি যে কী তা আমাদের জানা। এই প্রতিষ্ঠান টিকে থাকবে, প্রতিষ্ঠিত হবে।

যাই হোক, ইউএসটিসি-এর সম্প্রসারণ হওয়ার গোড়ার দিকে কোন বাধা বিপত্তি ছিল

চিকিৎসা বিজ্ঞানে অনন্য অবদানের জন্য জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলামকে ওয়াসিকা-ই-আত্রাব প্রদান করছেন করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. এহসান রশিদ ও মাঝে হামদর্দ প্রতিষ্ঠাতার পুত্র হাকিম

না, পরিচিতিও তেমন ছিল না। কেউ কেউ এমনকি উচ্চশিক্ষিত পরিচিত কয়েকজন শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে আমাকে বলেছিল, কাজটা অতি তাড়াহুড়ো করে শুরু করেছেন। আমার আত্মবিশ্বাস ছিল, অতীতের অভিজ্ঞতা ছিল। জবাবে বলতাম, টিনসেড থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং ব্যারাক থেকে সচিবালয়ের যাত্রা শুরু। পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট আইপিজিএমআর তথা বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল টিনসেড-এ। তা ছাড়া আমার হাতেই বাংলাদেশে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পোস্ট গ্রেজুয়েট চালু হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে ধার করা জায়গায় টিনসেড-এ। এতগুলো জিনিস দেখেছি, নিজ হাতে গড়ার সুযোগ পেয়েছি।

সুতরাং আমার দৃঢ় বিশ্বাস আইএএইচএস টিনসেড হলেও টিকে থাকবে। একদিন না একদিন প্রতিষ্ঠিত হবে। কয়েক বছর ধরে আমাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে। ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কযেকজন বিদেশী ছাত্রছাত্রীও ভর্তি হয়। যারা ভেবেছিল এই প্রতিষ্ঠান টিকে থাকা সম্ভব নয়, আপনা-আপনি বিলুপ্ত হয়ে যাবে, তাদের কিছু লোক ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে। ঈর্ষার মাত্রা বেশি পরিলক্ষিত হয় নিকটতম প্রতিবেশীর কর্মকান্ডে। আমাদের পাশে ছিল চক্ষু হাসপাতাল। জার্মানের অর্থ সাহায্যে এই হাসপাতাল স্থাপন।

বিপুল পরিমাণ জার্মানী অনুদান পেয়েও চক্ষু হাসপাতাল ছিল দোতলা পাশাপাশি আমাদের বহুতল ভবন নির্মাণ দেখে তিনি ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠেন। দু'তলা ভবন তার পাশে একটি পাহাড়ের টিলায় আমাদের ভবন যখন আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠতে থাকে, এই ঈর্ষা প্রথম থেকেই প্রবল হয়ে ওঠে। ডাঃ রবিউল হোসেনকে সরল এবং সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে অতি সম্মানের সাথে একাডেমিক কাউন্সিল-এর ভাইস চেয়ারম্যান মনোনীত করেছিলাম। নানা সমালোচনার কথায় পরবর্তীতে তাঁকে কন্সট্রাকশন কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত করি। তিনি তখন কাজে-কর্মে প্রমাণ করতে লাগলেন, আইএএইচএস থেকে চক্ষু হাসপাতালের গুরুত্ব বেশী। এমনকি ইউএসটিসি অংশের মাটি কেটে চক্ষু হাসপাতালের জায়গা ভরাট করার প্রবণতা দৃষ্টিকটুভাবে পরিলক্ষিত হয়। মাটি ভরাটের অবস্থা দেখে আমরা অবাক হই।

আইএএইচএস কন্সট্রাকশন কমিটির চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক ও ম্যানেজিং ট্রাস্টি বিএনএসবি ও পরিচালক আই ইনফরমারলী, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম এর ডাঃ রবিউল হোসেনের কাছে কোন একটি সভায় গভর্নিং বডির সরলমনা কিছু সদস্য ব্যাপারটা জানতে চাইলে এবং এ ব্যাপারে তাঁকে ব্যাখ্যা দিতে বললে তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হন এবং পরবর্তীতে কমিটির সাথে সম্পর্ক ছেদ করেন। শুরু করলেন আইএএইচএস-এর বিরুদ্ধে নানা প্রকাশ্য ও গোপন ষড়যন্ত্র এবং অপপ্রচার।

তিনি প্রথমেই এই প্রতিষ্ঠানের কোমলতি ছাত্রছাত্রীদেরকে নানা মিথ্যা তথ্য দিয়ে বললেন, তোমরা এই প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করলে মানুষের ডাক্তার হতে পারবে না। হয়তো একজন শিক্ষিত কোয়াক (গ্রাম ডাক্তার) হতে পারবে। কারণ এই প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশ মেডিকেল এণ্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের স্বীকৃতি নেই, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোজন নেই। দুর্ভাগ্যক্রমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের একাংশ আমাদের স্বপক্ষে ছিল না, ফলে স্বীকৃতি দিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অহেতুক বিলম্ব ঘটায়, এদিকে বাংলাদেশ মেডিকেল এণ্ড ডেন্টাল কাউন্সিল থেকেও স্বীকৃতি দানের বিষয়টিও ছিল প্রক্রিয়াধীন। এমতাবস্থায় তারা যে অপপ্রচার চালায় তাতে ছাত্র-ছাত্রীরা বিভ্রান্ত হয়, তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্ধিহান হয়ে পড়ে। তারা অপপ্রচার চালাতে থাকে এই প্রতিষ্ঠানে টাকা-পয়সার কোনরূপ হিসাব-নিকাশ নেই। ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির নামে গৃহীত টাকা আত্মসাৎ করে বিদেশে (লন্ডনে) বাড়ী কিনেছে। এহেন সবগুলি মিথ্যা এবং বানোয়াট কথা বলে শিক্ষার্থীদের ক্ষেপিয়ে তুললেন। তিনি আরো বললেন, আইএএইচএসকে সম্পূর্ণ রূপ না দিয়ে ইউএসটিসি প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে আরো একটি প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছে কর্তৃপক্ষ।

১৯৯৩ সালের জুলাই মাসে আমার পূর্ব-নির্ধারিত একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম আগমনের কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে তিনি কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে তাদেরকে ক্যাম্পাসে অবস্থান ধর্মঘট ডাকতে বাধ্য করে,

জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলামের তিন রত্ন (বাম থেকে) ছেলে ইফতেখার এমএ (যিনি শিক্ষা জীবনে মেধা তালিকায় সর্বস্তরে প্রথম স্থানের গৌরব অর্জন করেছিলেন) , বড় মেয়ে দীনা ইসলাম এমবিএ, ছোট মেয়ে ডাঃ নীনা ইসলাম এফসিপিএস।

আইএএইচএস-এর প্রবেশমুখে অবস্থান ধর্মঘট শুরু করে। তারা কোন যানবাহন ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে দেবে না। কোন রকম পূর্ব অবহিতকরণ ছাড়াই ক্লাস বর্জন করে এ অবস্থান ধর্মঘটে যোগদান করতে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে তিনি বাধ্য করেন। আমি আসার পথে জানতে পারলাম তাদের এ অবস্থানের কথা। তখন আমি তৎকালীন পুলিশ কমিশনারকে ঘটনাটি জানালাম। তিনি আমাকে আধঘন্টা পরে ক্যাম্পাসে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন যাতে ইতিমধ্যে পরিস্থিতি সামাল দিতে পারেন। আধাঘন্টা পরেও তিনি আমাকে কোন রূপ আশ্বাস দিতে পারেননি। তখন আমার সাথে ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পপতি, ইউএসটিসি'র দাতা ও সিন্ডিকেট সদস্য এম.এ.সালাম. শিল্প ব্যাংকের ঊর্ধতন কর্মকর্তা শাহ আলম চৌধুরী। তাঁদেরকে নিয়ে আইএএইচএস-এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। আমি এসে দেখি কিছু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী রাস্তায় অবস্থান নিয়েছে যাতে করে অফিসে যেতে না পারি। তাদের কাছে গিয়ে গাড়ী থামিয়ে আমি বললাম- আমি গাড়ী নিয়ে অফিসে যাব, হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়। প্রথম ব্যাচের ছাত্রী শায়লা চৌধুরী বললো, 'স্যার আপনি নামেন আমি ধরে ধরে নিয়ে যাব।' জবাবে বললাম, 'আমি গাড়ি নিয়েই যাবো। আর যদি এখান থেকে ফিরে যেতে হয় তাহলে জীবনেও এখানে আসবো না।" তখন এ অবস্থা দেখে তৎকালীন পরিচালক অধ্যাপক ডিপি বড়ুয়া, ডেপুটি ডাইরেক্টর মাহমুদুল হক চৌধুরী, সিনিয়র শিক্ষকদের নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বুঝানোর চেষ্টা করলেন। তারা আমার জোরালো কথা এবং চোখ ও চেহারার অনমনীয় মনোভাব দেখে সকলে রাস্তা ছেড়ে দিল। গাড়ি নিয়ে অফিসে গেলাম। এর পূর্বে তারা প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও অভিভাবক এম এ ওয়াহাব, সমাজকর্মী জনাব নাজমুল আলম, অধ্যাপক মোক্তার আহমেদ ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জানে আলমকে অপমান করে। আমি শিক্ষকদের সাথে জরুরী সভায় বসে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করার শেষ পর্যায়ে নিজেকে সামলাতে না পেরে মনের ক্ষোভে বললাম, আজকে যা ঘটেছে তাতে আমি মর্মাহত।

আমি নই, এম এ ওহাবের মত প্রবীণ রাজনীতিবিদসহ প্রতিটি অভিভাবক নিঃস্বার্থভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের সৎপথে পরিচালিত করতে এবং আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই অপমানিত হয়েছিলেন। তাঁদের উপদেশ প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। ছাত্ররা মনে করেছিল হতাশ হয়ে আমি ফিরে যাব। তরুণ ছেলেমেয়েরা আমার পরিণত জীবনের নিদারুণ অভিজ্ঞতার কথা জানত না। তারা জানত না কত দৃঢ়তার সাথে জীবনের গতিপথে আমি কত বাধা সাহসের সাথে অতিক্রম করে বার বার সফলতা অর্জন করেছি।

পিজি, পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এর সূচনালগ্নে যে সমস্ত কর্মীরা আমাকে লাঞ্ছিত করতে এগিয়ে এসেছিল তারা আমাকে আজ তাদের পরমহিতৈষী বন্ধু হিসাবে গণ্য করে। অনেকে পিতার আসনে স্থান দেয়। আমি তাদের ভালবাসি, মঙ্গল চাই। এ মনোভাব বুঝতে পেরে তারা আমাকে ঘৃণার পরিবর্তে ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা দিয়ে বরণ করে নেয়।

এর পরে অভিভাবক ফোরামের নাম দিয়ে ডা. রবিউল হোসেন সংবাদপত্রে নানা বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আইএএইচএস/ইউএসটিসির কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রী ও শান্তিপ্রিয় অভিভাবকদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন। তাঁরা নানাভাবে বুঝাতে লাগল এ প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব থেকে আমাকে সরাতে না পারলে এ প্রতিষ্ঠান একদিন অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে। তখন তাঁর সহযোগীদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক ডা. মোয়াজ্জেম হোসেন (তার মেয়ে এই প্রতিষ্ঠান থেকে ভালমত পাস করে এই প্রতিষ্ঠানেই প্যাথলজী বিভাগে প্রভাষক পদে কর্মরত রয়েছেন), ডা. এম এ জাফর, ডা.এ.কে.এম. জালাল উদ্দীন আহমেদ, ডিপি হক, ফারুক-ই-আজম বীর প্রতীক। পরবর্তীতে ছাত্র-ছাত্রীদের একটি গ্রুপ (শোয়েব, বিপ্লব পালিত, সোলতান, পংকজ, শুভ্র, মান্নান, ফখরু, ফোরকান প্রমুখ) সহাকারী সচিব জসীম উদ্দীনের মাধ্যমে আমার সাথে যোগাযোগ করে। আমি তাদেরকে এহেন অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে নিজেদের ভবিষ্যতের কাঁটা দূরীভূত করার জন্য নির্দেশ দিলাম। সে অনুসারে তারা যখন অভিভাবকদের মাঝে এ ব্যাপারে জনমত সৃষ্টি করার চেষ্টা করছিল তখন তাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসীদের অত্যাচারে তারা মেস ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয় নিতে বাধ্য হল। এই পরিস্থিতিতে যখন ছাত্র-শিক্ষকরা নানা হতাশায় ভুগছিল তখন আমি সাংবাদিক সম্মেলন করি তাঁদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে। এসময় আমার সাথে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক এ জে এম নুরুদ্দীন চৌধুরী, এম এ সালাম, মোজাফর আহম্মেদ মিয়া, অধ্যাপক ডিপি বড়ুয়া, ডা. মাহমুদুল হক চৌধুরী, ডা. সাঈদ, ডা. আবুল কাশেম, ডা. মোস্তাক আহমেদ ও সচিব আবুল কাশেম। সেদিন আমি বলেছিলাম আমার আর পাবার কিছুই নেই। চট্টগ্রামের সন্তান হিসাবে চট্টগ্রামকে কিছু দেওয়ার জন্য এসেছিলাম। আমার এই সংবাদ সম্মেলনের পরে রবিউল হোসেন ২৮-৭-৯৩ইং তারিখে জেলা পরিষদ মিলনায়তনে সভা আহ্বান করে আবারো

মামা প্রফেসর ডা. নুরুল ইসলাম এর সাথে আলহাজ্ব মোঃ আবদুল মাবুদ

অপপ্রচার শুরু করলেন। তখন তার জবাবে আমি সকল চট্টগ্রামবাসী ও মহল্লা সর্দার কমিটির নেতৃবৃন্দকে নিয়ে এক সভায় বসি এবং তাদের সহযোগিতা কামনা করি। তখন আমাকে যে দুজন সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছিলেন তাঁরা হলেন মহল্লা সর্দার কমিটির সভাপতি প্রয়াত আবুল খায়ের মেম্বার ও প্রয়াত

মোঃ মিয়া। তাঁদেরকে নিয়ে ইউএসটিসি ক্যাম্পাসে এক সুধী সমাবেশ করি। এতে উপস্থিত ছিলেন এ্যাডভোকেট নুরুল হুদা, এ্যাডঃ শামসুল হুদা, ইঞ্জিঃ আফসার উদ্দীন, এম এ সালাম, ড. আবুল কাশেম, মহল্লা সর্দার কমিটির আবুল খায়ের, মোহাম্মদ মিয়া প্রমুখ চট্টগ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। আরো কিছু দিন পর আমরা অভিভাবকদের নিয়ে ক্যাম্পাসে এক সভা আহ্বান করি। এতেও ডা. রবিউল হোসেনের অভিভাবক ফোরামের সম্পাদক ডা. জাফর অনেক মিথ্যা তথ্য দিয়ে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। তখন

কর্তৃপক্ষের পক্ষ নিয়ে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন এমপি এম এ ওয়াহাব, ডা. আফসারুল আমিন প্রমুখ। এরপরও তাঁরা সমস্যার সমাধান না করে আরো বেপরোয়া হয়ে নতুন নতুন ষড়যন্ত্র শুরু করেন।

১৬ আগষ্ট ১৯৯৩ আমি ইউএসটিসি'র উত্থাপিত সমস্যাদি সমাধান করার জন্য সমস্ত অভিভাবকদের নিয়ে একটি সমাবেশ আহবান করি। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন সিটি মেয়র মীর মোঃ নাসির উদ্দীন। সে দিনের সভায় চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা. রবিউল হোসেন সকল প্রকার সৌজন্যতাবোধ পরিহার করে সভা মঞ্চে এসে মাইক দখল করার যে ঔদ্ধত্যপূর্ন আচরণ করেন তা কখনো ভুলার নয়। তারপরও উপস্থিত মেয়র নাসির উদ্দীনের হস্তক্ষেপে তা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হই।

১৬ আগস্ট সিন্ডিকেট সভায় ২২ আগষ্ট থেকে ক্লাস শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। উক্ত সিন্ডিকেট সভায় উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী, অধ্যাপক এ জে নুরুদ্দীন চৌধুরী, ডা. আবুল কাশেম, এম এ সালাম, মোজাফ্ফর আহমেদ মিয়া। সভা-সমাবেশ করার ক্ষেত্রে ক্যাম্পাসে সুষ্ঠু পরিবেশ ছিল না বিধায় কাতালগঞ্জস্থ জনসেবা অফিসকেই ইউএসটিসি'র বিকল্প অফিস হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

ঐ অফিসে সার্বিকভাবে যাঁরা সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাঁরা হলেন প্রাক্তন সংসদ সদস্য আবদুল্লাহ আল হারুণ, বিশিষ্ট সমাজসেবক ও প্রবীণ রাজনীতিবিদ এম এ ওয়াহাব, রাজনীতিবিদ ওয়াকিল আহমেদ তালুকদার মল্লিক, ড. আবুল কাশেম, আবুল কালাম, আবদুল করিম, আইএএইচ এস এর সচিব আবুল কাশেম। সিটি মেয়র মীর নাসিরের মধ্যস্থতায় উক্ত সমস্যাদির আপাতত সমাধান হলেও তথাকথিত অভিভাবক ফোরামের সভাপতি ডা. রবিউল হোসেন তার সব ধরনের ষড়যন্ত্র ইউএসটিসির বিরুদ্ধে চালিয়ে যাচ্ছিল। যার ফলশ্রুতিতে তার নিকটতম বন্ধু আশিকুর রহমানকে ব্যবহার করে চট্টগ্রামের দ্বিতীয় সাবজজ আলাদতে ইউএসটিসি'র কার্যক্রমের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং এটি একটি অবৈধ প্রতিষ্ঠান যার কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হোক রায় প্রার্থনা করে ১৯৯৪ সালে একটি মামলা দায়ের করেন। যা ১৭-৭-২০০১ সালে বিজ্ঞ আদালত মামলার প্রার্থনা সঠিক নয় বলে খারিজ করে দেন। এরপর আবারো ছাত্র-ছাত্রীদের নানা বানোয়াট কথা বলে ক্ষেপিয়ে তোলেন যার পরিস্থিতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার জন্য প্রফেসর মোঃ আলীকে ইউএসটিসি ক্যাম্পাসে পাঠালে পাহাড়তলী কলেজের তৎকালীন প্রিন্সিপ্যালের ছেলে শেখ মিরাজের (যে গত দশ বছরেও ডাক্তার হতে পারেনি) নেতৃত্বে উচ্ছৃংখল গ্রুপ ডাইরেক্টর অফিসের দরজায় লাথি মেরে দরজা ভেঙ্গে আসবাবপত্র তছনছ করে এবং প্রফেসর মোঃ আলীকে অপমান করে। অথচ পাহাড়তলী কলেজের ঐ প্রিন্সিপ্যাল মাজেদুল হক ছিল মোহাম্মদ আলীর ছাত্র। আমি নিজের অর্থ দিয়ে শেখ মিরাজকে পড়ালেখা করার জন্য প্রথম বর্ষের সবগুলো বই কিনে দিয়েছিলাম। পরে মিরাজের কার্যক্রমের জন্য তার পিতা মাজেদুল হক লজ্জিত হন। পরের দিন একটি

মাইক্রোবাসে করে ডা. রবিউল গ্রুপ আরো কিছু উচ্ছৃংখল ছাত্র নিয়ে ক্যাম্পাসে বোমা ফাটিয়ে ও আগ্নেয়াস্ত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে সকলকে ক্যাম্পাস ত্যাগে বাধ্য করে। এ ব্যাপারে পাহাড়তলী থানায় তখন একটি সাধারণ ডায়েরী লিপিবদ্ধ করা হয়। এর বাদী ছিলেন ইউএসটিসি'র সচিব আবুল কাশেম। এর প্রেক্ষিতে কয়জন ছাত্রকে গ্রেফতার করলে ডা. রবিউল হোসেন ঐসব ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্বদানকারী সরকার মাহাবুব শামীম, বিপ্লব, মিরাজ, আরিফ বাচ্চুকে নিজের টাকায় থানা থেকে ছাড়িয়ে আনেন। পরবর্তীতে একই ঘটনায় আরো একটি মামলা হয় সন্ত্রাস দমন আইনে। যার বাদী ছিলেন, তৎকালীন কনস্ট্রাকশন কমিটির মেম্বার মোহাম্মদ উল্লাহ। এর পরে ১৯-০৯-৯৩ সালে শিক্ষানুরাগীদের এক সমাবেশ আহবান করি ইউএসটিসি ক্যাম্পাসে। আমার (ডা.নুরুল ইসলাম) সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইঞ্জিনিয়ার আফসার উদ্দীন আহমেদ, বদরুল আনোয়ার, এম এ ওয়াহাব, আবুল খায়ের মেম্বার, ফজলুস সোবাহান চৌধুরী, এস.এম.আমাল উদ্দীন, আব্দুস সালাম মাস্টার, অধ্যক্ষ ড. আবদুস ছবুর চৌধুরী, এম.এ.জি রিজভী, ডা. আফসারুল আমিন, এ্যাডভোকেট নুরুল হুদা, ডা. শফিউল হাসান, সাবেক সংসদ সদস্য এম শামসুল হুদা, আলহাজ্ব মোহাম্মদ মিয়া সাবেক সাংসদ আবদুল্লাহ আল হারুণ চৌধুরী, এম এ সালাম ও প্রফেসর মোহাম্মদ আলী।

এ সভার পরে. ডা. রবিউল হোসেন গ্রুপ আমার ও আমার প্রতিষ্ঠানের প্রতি চট্টগ্রামের সর্বস্তরের মানুষের সমর্থন দেখে হিংসা ও আক্রোশে ফেটে পড়েন এবং ২২.০৯.১৯৯৩ সালে নিজের চেম্বার নিজের লোক দ্বারা ভেঙে দিয়ে আমার ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার অপচেষ্টা শুরু করেন। তাঁর এহেন কারসাজি জনগণ বুঝতে পারে, ফলে তা বেশীদূর আগাতে পারেনি।

এর কিছুদিন পর ৫ জানুয়ারী ১৯৯৪ সনে তৎকালীন মন্ত্রী কর্নেল (অবঃ) অলি আহমদ বীর বিক্রম ইউএসটিসি পরিদর্শন করেন এবং এর সর্বাঙ্গীণ কার্যক্রমের অগ্রগতি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। ০৬.০১.১৯৯৪ তৎকালীন শিক্ষা সচিব ইরশাদুল হক ইউএসটিসি পরিদর্শনে এসে এর যাবতীয় কার্যক্রম দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। যার ফলে ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে প্রাণসঞ্চার ফিরে আসে এবং আমরা ২৪.০১.১৯৯৪ ইউএসটিসির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। ২৩.০১.১৯৯৪ সকালে ফ্লাইটে চট্টগ্রামে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আমি ঢাকা বিমান বন্দরে আসি এবং ভিআইপি লাউঞ্জে মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ি। সাথে সাথে আমাকে ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

চট্টগ্রাম তথা সমগ্র বাংলাদেশের মানুষের দোয়ায় সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে সফল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে আমি আবার সুস্থ হয়ে উঠি। এরপর ইউএসটিসি গঠনে আমি সম্পূর্নরূপে নিজেকে সম্পৃক্ত করি।

ঢাকার সেন্ট্রাল রোডস্থ গুলমেহের ভবনে জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলামের সাথে চট্টলচিত্র'র প্রধান সম্পাদক জামাল উদ্দিন ও সম্পাদক শরীফা বুলবুল

ইতিমধ্যে প্রাক্তন সচিব এবং রাষ্ট্রদূত আহমেদ ফরিদ ইউএসটিসি'র ভিসি নিয়োগ হবার পর কয়েকজন রাষ্ট্রদূতকে ইউএসটিসি-তে আমন্ত্রণ জানান এবং ২৮ জুন ১৯৯৪ ইউএসটিসি পরিদর্শন করেন মালয়েশিয়ান হাই কমিশনার আহমেদ কুজি বিন হাদী আবদুর রাজ্জাক, ইন্দোনেশিয়ান রাষ্ট্রদূত হাজী আহমেদ লোক বাহাদুর শ্রেষ্ঠা। তাঁদের সম্মানে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যার সংবাদ আঞ্চলিক ও জাতীয় দৈনিকে গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়। এতে ইউএসটিসি'র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীরা কিছুটা হলেও ষড়যন্ত্র থেকে পিছু হটলেও বসে থাকেনি। তারা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য আর.আই.চৌধুরীকে নানাভাবে প্ররোচিত করে আইএএইচএস-এর শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে না নিতে সম্মত করেন এবং তাঁর মৌখিক নির্দেশে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অফিস আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার এন্ট্রি ফরম ও ফি নিতে অস্বীকার করে। আমরা অনন্যোপায় হয়ে ৩০ এপ্রিল চট্টগ্রামের তৃতীয় সাবজজ আদালতের শরণাপন্ন হই এবং বিজ্ঞ জজ মোঃ শাহাবুদ্দীন চ.বি.কে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের এন্ট্রি ফরম ও ফি গ্রহণ করতে আদেশ দেন। পরবর্তীতে পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পর রেজাল্ট প্রকাশ করতেও গড়িমসি করে। তখন আমরা পুনরায় আদালতের শরণাপন্ন হই। ঐ একই জজ ২২ আগষ্ট চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে পরীক্ষার ফল প্রকাশের আদেশ দেন। যার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের

অস্থিরতা দূরীভূত হয়।

এরই মধ্যে নেপাল, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, মালয়েশিয়াসহ আরো অনেক দেশের ছাত্র-ছাত্রী ইউএসটিসিতে ভর্তি হয়ে প্রতিষ্ঠানের সুনাম সারা দেশে এবং বহিঃবিশ্বে ছড়িয়ে দেয়। ২০ জানুয়ারি ১৯৯৪ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন চ্যান্সেলর জনাব আবদুর রহমান বিশ্বাস ইউএসটিসি'তে আসেন এবং সাসাকাওয়া সেন্ট্রাল লাইব্রেরী ও ইউএসটিসি'র হাসপাতাল উদ্বোধন করেন। ঐ দিন আরো উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমান ও সিটি মেয়র মীর মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন। তাঁদের ইউএসটিসি'তে আসার পরিপ্রেক্ষিতে এর প্রতি সহকারী সমর্থনের বহিঃ প্রকাশ ঘটে। এর ফলে ছাত্র-শিক্ষক কর্মকর্তা, কর্মচারীরা ব্যাপক আশাবাদী হয়ে পূর্ন উদ্যমে কাজ শুরু করেন। এ সময় যে সব অভিভাবক খুবই সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছিলেন তাঁরা হলেন ডা. এম এ মান্নান, ডা. ফরিদুল আলম চৌধুরী, ডা. মোশারফ, আবুল কাশেম, হাফেজ মোহাম্মদ শরীফ, ইঞ্জিনীয়ার গিয়াস উদ্দীন, ইঞ্জিনীয়ার রফিকুল হাসান, সৈয়দ আহমেদ, দিলদার আহমেদ দিলু। বিশিষ্ট চর্ম ও যৌন রোগ বিশেষজ্ঞ এবং পিজি'র অধ্যাপক ডা. আবদুল অদুদ। সাহায্য-সহযোগিতাকারীদের মধ্যে যাঁর নাম করতেই হয় তিনি হলেন প্রাক্তন ছাত্রনেতা নূর-ই-আলম সিদ্দিকী।

আমাদের চলার পথে যেমন অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষী ছিল, তেমনি মুষ্টিমেয় ব্যক্তি চিকিৎসা পেশায় সরকারের মর্যাদাপূর্ন পদে অধিষ্ঠিত থেকে আমাদের বিরুদ্ধে নানা বাধাবিপত্তির সৃষ্টি করে ক্ষতি করার অপচেষ্টা চালিয়েছিল তাদের মধ্যে একজন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন মহিলা অধ্যক্ষ (স্ত্রী ও ধাত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ) এবং অন্যজন তৎকালীন স্বাস্থ্য বিভাগের মহাপরিচালক (মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ) অন্যতম। তাঁদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিল একজন অত্যন্ত সাহসী, ন্যায়পরায়ণ ও সৎ লোকের কারণে। তিনি হচ্ছেন আমার ছাত্র অধ্যাপক (ডা. শামসুদ্দীন সিদ্দিকী, স্বাস্থ্য বিভাগের প্রাক্তন পরিচালক (শিক্ষা) ও মহাপরিচালক)।

এরপর ১৯৯৬ এর মে মাসে ১ম পেশাগত এম বি.বি.এস. পরীক্ষায় ডা. মাহফুজুর রহমানের ছেলে ফরহাদ মঞ্জুর ফিজিওলজি ও বায়োক্যামিষ্ট্রি বিষয়ে অকৃতকার্য হলে তৎকালীন পরীক্ষা-নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক জাফর আলম, সহকারী অধ্যাপক ডা. স্বপন চৌধুরীর বাসায় তারা হামলা করে এবং সন্ত্রাসী কায়দায় শিক্ষকদেরকে প্রাণনাশের হুমকিসহ বিভিন্ন অন্যায় চাপ সৃষ্টি করতে থাকে।

অধিকন্তু ইউএসটিসি ক্যাম্পাসে কর্মচারীদের হুমকি প্রদর্শন করতে থাকে। তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার আবুল কাশেমের প্রাণনাশের অপচেষ্টা চালায়। হেন পরিস্থিতিতে তারা ইউএসটিসির সকল প্রকার কার্যক্রম বন্ধ করে দেয় এবং ডা. মাহফুজুর রহমান ও তাঁর পুত্র ফরহাদ মঞ্জুর ইউএসটিসির বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার করতে থাকে। এর পর তাকে বলেছিলাম কেউ ইউএসটিসির সুনাম ও ঐতিহ্য ম্লান করতে পারবে না। এতে

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র কর্মকর্তা সহ সিন্ডিকেট সদস্যবৃন্দ। একটা ডিসিপ্লিনারী কমিটির মাধ্যমে ফরহাদ মঞ্জুরকে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং এই কমিটির সুপারিশক্রমে তাকে ২ বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়।

এর পর ডা. মাহফুজুর রহমানের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং আর্থিক বিনিয়োগের ফলে ছাত্র আন্দোলন কিছুটা বেগবান হয়। শুভাকাঙ্ক্ষী কয়েকজনের সুপারিশক্রমে এই সময়ে আমি আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা আজম নাছিরের সহযোগিতা কামনা করলে তিনি ও আমার নাতি ইঞ্জিনিয়ার রফিকের বন্ধু টেলিফোন বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার গিয়াস উদ্দীন এগিয়ে আসেন। তাদের দু'জনের মধ্যস্থতায় এবং হুঁশিয়ারিতে মাহফুজ কিছুটা বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে। জাসদের নেতা আসম আবদুর রব তখন পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত। জাসদের নেতা মাহফুজ আসম আবদুর রব এর সাহায্য কামনা করে। জবাবে আসম আবদুর রব বলেন, অন্য কোথাও হলে তোমাকে সাহায্য করতে পারতাম। কিন্তু যেখানে ডা.নুরুল ইসলাম জড়িত সেখানে আমি কিছু বলতে পারব না, কারণ তিনি আমাদের পিতৃতুল্য সম্মানিত।

এদিকে নানা ওসিলায় ইউএসটিসির শিক্ষা কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্থ করছিল ডা. ইমাম উদ্দিন ও তার সহযোগীরা। এ অনৈতিক ঘটনার প্রেক্ষিতে তাঁকে অপসারণ করা হলেও ইউএসটিসির কিছু স্বার্থন্বেষী শিক্ষক ও তৎকালীন বিএমএ-চট্টগ্রাম মিলে ইউএসটিসির শিক্ষা ও চিকিৎসা ৬ মাস বন্ধ করে দেন। পরবর্তীতে সিটি মেয়র এ.বি.এম. মহিউদ্দিন চৌধুরীর সহযোগিতায় এ সমস্যার সমাধান হয় কিন্তু তাঁর দেওয়া শর্ত মোতাবেক তৎকালীন বিএমএ চট্টগ্রামের সভাপতি অধ্যাপক এল.এ. কাদেরিকে ইউএসটিসির প্রো-ভিসি করতে সম্মতি দিই, কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

এর পর প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ মে ২০০২ সালে বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হসপিটালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য ইউএসটিসি'তে আসেন।

জামাল উদ্দিন : ইউএসটিসি'র ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠান। প্রথম সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন ও দ্বিতীয় সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক এ কিউ এম বি চৌধুরী চ্যান্সেলর হিসেবে ইউএসটিসি'তে পদার্পণ করলেন এ সম্পর্কে আপনার প্রতিক্রিয়া...

ডা. নুরুল ইসলাম : ইউএসটিসি প্রতিষ্ঠার পর আইএএইচএস এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠানে রূপ নেয়। এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়-আওতা থেকে মুক্ত হয় এবং রাষ্ট্র প্রধান পদাধিকার বলে চ্যান্সেলর হন। বিচারপতি সাহাবুদ্দিন রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে একজন সাহসী নিরপেক্ষ সৎ লোক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ছিল গভীর। তিনিও আমাকে ভালবাসতেন। যেহেতু আমাদের কিছু কিছু ছাত্র ইতিমধ্যে এমবিবিএস পরীক্ষায় পাশ করে ডাক্তার হয়ে গেছেন কেউ কেউ চাকুরীতে যোগ দিয়েছিলেন, তখন একটি সমাবর্তন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ জানালে

তিনি সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন। এ ঘটনায় কুচক্রী দল বিচলিত হয়ে পড়ে এবং ফরহাদ মঞ্জুর নানা কুৎসা রটনা করে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট লিখিত অভিযোগ ফ্যাক্স যোগে পাঠায়। আমার উপর তাঁর বিশেষ আস্থার কারণে তিনি এই অভিযোগকে আমল দেননি। নির্দিষ্ট দিনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এসে আমাদের অবস্থান দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং তাঁর সহজ সরল ভাষায় জোরালোভাবে বলেন, "আমি এখন কি দেখতেছি ! অথচ শয়তানরা আমাকে কি বলেছিল।"

প্রথম সমাবর্তনের সফলতা এবং অভিজ্ঞতা আমাদের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে উৎসাহিত করে। ইতিমধ্যে চিকিৎসা পেশায় অতি সম্মানিত বিরল ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক এ কিউ এম বি চৌধুরী রাষ্ট্রপতির আসন গ্রহন করেন। দ্বিতীয় সমাবর্তনে আমন্ত্রণ জানালে চ্যান্সেলর হিসাবে তিনি সানন্দে সম্মতি জানান। অতি অল্প সময়ে পর পর দুইটি সমাবর্তন ইউএসটিসি'র উত্তরোত্তর সফলতারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

শরীফা বুলবুল : ইউএসটিসি'র আদলে কোথাও আর কোনো হাসপাতাল করার ইচ্ছে আছে কী ?

ডা. নুরুল ইসলাম : হ্যাঁ, কক্সবাজারে একটি ক্যাম্পাস করার পরিকল্পনা চলছে। যেখানে বাবা মোস্তাফিজুর রহমান দিয়েছেন দশ একর জমি ছেলে লুৎফুর রহমান কাজলও দিয়েছেন দশ একর জমি। সৎ কাজে পিতার সহিত প্রতিযোগিতা উপযুক্ত ছেলের লক্ষন। কোনটা রাখি কোনটা ফেলি এ সমস্যায় পড়লাম। মুস্তাফিজুর রহমানকে (পিতা) তখন বললাম একটা বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিৎ হবে আপনাদের দু'জনের দেয়া জায়গার মধ্যে কারটা ক্যাম্পাসের জন্য উপযুক্ত হবে। আমার এ প্রস্তাব উভয়ে সাদরে গ্রহণ করলেন পরবর্তীতে কমিটি সুপারিশ করল ছেলের দেওয়া জায়গাটা নেওয়ার জন্য। বাবা এতে সন্তোষ প্রকাশ করলেন, হাসি মুখে তার মত প্রকাশ করলেন। তার ইচ্ছা কক্সবাজারে কিছু একটা হোক। সেটা যেখানে হোক না কেন। পিতা পুত্রের একই মনোভাব আমাকে খুবই উৎসাহিত করল। পরবর্তীতে সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিই। এখানে দুটো ফ্যাকাল্টি হবে। এগুলোর উপর জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একটি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশের প্রধানতম সমস্যা জনসংখ্যা। অন্যটা সাম্প্রতিক কালে সারা বিশ্বে আলোচিত এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ/ পরিবেশ। এ সকল বিবেচনায় আমাদের প্রস্তাবিত ফ্যাকাল্টিটি জনসংখ্যা এবং পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে।

শরীফা বুলবুল : আপনার ইউএসটিসি'তে গরীব মেধাবী ছাত্রদের কোনো সুযোগ আছে কী ?

ডা. নুরুল ইসলাম : এক কথায় বলবো সুযোগ আছে, এক কথায় বলবো যে নাই। প্রথম ক্ষেত্রে নাই কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আছে। যদি কোনো ছাত্র এখানে ভর্তি হয়, সে

যদি মা বাবা দু'জনকে হারায়-তাকে আমরা টাকা দিয়ে পড়াই। তার পড়াশোনা বন্ধ করে দিই না। এরকম লেবানন
পাকিস্তান বাংলাদেশ থেকে বেশ কয়েকজন ছাত্র এসেছে।
শরীফা বুলবুল : এতে বাংলাদেশী ছাত্রদেরই বেশী অগ্রাধিকার পাওয়ার কথা নয় কি ?
ডা. নুরুল ইসলাম : বেশী অগ্রাধিকার পাওয়ার তো কথা কিন্তু সবাই তো আমাদের ইউনিভার্সিটির ছাত্র।
জামাল উদ্দিন : মেধা যাচাই করে যদি... ?
ডা. নুরুল ইসলাম : যদি কোনো ছেলে আমরা দেখি যে প্রথম বর্ষে প্রথম হয়। তাহলে দ্বিতীয় বর্ষে সে যদি বলে যে আমার টিউশন ফি ফ্রি করে দেন, তখন আমরা করে দেব। আমি যে রোগী দেখে দুই হাজার টাকা করে পাই সে টাকা আমি নিই না। আমি মাইনা নিই না। বিচারপতি শাহাবুদ্দিন সাহেব নিজের মাইনা নিতেন। যেহেতু আমি ফাউন্ডার আমি নিজের নাম নিজে অপোজ করি। ফাউন্ডারের একটা ব্যাপার কি জানেন, কোনো ভাইস চ্যান্সেলর অ্যাপয়েন্টেড হলে ফাউন্ডার এর সুপারিশ করে। কিন্তু আমার নিজের জন্য নিজে সুপারিশ করিনি। পরবর্তী ভাইস চ্যান্সেলর আমার সুপারিশেই হবে। সরকার সুপারিশ করলে পারবে না। আমি আমার নিজের মাইনা করেছি ৩০ হাজার টাকা। বিচারপতি শাহাবুদ্দিন বললেন, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর, এক লাখ টাকা মাইনা নেন। আপনি নিচ্ছেন তিরিশ হাজার টাকা, এটা কি করলেন ? আমি বললাম, আমি একটা ফান্ড করেছি তাতে দেব। আমার এপয়েনমেন্ট লেটারে লেখা আছে তিরিশ হাজার টাকা মাইনা, এটা আমি একটা ওয়েলফেয়ার ফান্ড করেছি সেখানে জমা দেব। এর সাথে আমি যে রোগী দেখি ৫ জন ৭জন ১০জন যা পারি যেমন- কক্সবাজারে দু'দিনে রোগী দেখেছি ৭০জন এতে ৪০/৫০ হাজার টাকা পেয়েছি- ঐসব টাকা ওয়েলফেয়ার ফান্ডে জমা হয়। যদি কেউ পড়তে না পারে ঐ ফান্ড থেকে ওদেরকে স্কলারশিপ দিই। পরীক্ষা দিতে না পারলেও ওখান থেকে দিই। এজন্য কেউ বলতে পারে না কারণ রিসিট নিয়েই তা তাদের দেয়া হয়। এ টাকা আমার নিজের হাতেই দিই। সরকার আমাদের এক টাকাও দেয় নি। সবগুলি নিজের টাকাই। সরকারের একটি পয়সাও আমি পাইনি। মানুষ মনে করে সরকার অনেক টাকা দিয়েছে। অনেকে মনে করে বঙ্গবন্ধুর চিকিৎসক হওয়ার সুযোগে শেখ হাসিনার শাসনামলে আওয়ামী লীগের মন্ত্রিসভা আমাকে বিরাট অঙ্কের অনুদান দিয়েছেন।
সেই সম্পর্কের কারণে বঙ্গবন্ধুর নামে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য আওয়ামী লীগ বিশেষ করে শেখ হাসিনার টাকা বরাদ্দ করা এক নৈতিক দায়িত্ব ছিল। সে দায়িত্ব তিনি একেবারেই পালন করেননি। টুঙ্গীপাড়ায় হাজার হাজার টাকার কাজ হয়েছে।
যৌক্তিকতা আছে তা-ও অখুশি হওয়ার কথা নয় নিজের বাবার জন্য মেয়ে এমন কিছু করলে এটা অপরাধের নয়- অভিনন্দনযোগ্য। একই পরিমাপে বঙ্গবন্ধু হাসপাতাল

প্রতিষ্ঠায় তাঁর (শেখ হাসিনা) এগিয়ে আসা উচিৎ ছিল। না এসে তিনি নিরপেক্ষতার পরিচয় দেন নি ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করেননি। ভুল করেছেন। বর্তমান সরকার এগিয়ে না আসলে সেটা তাদের রাজনৈতিক উদারতা বহন করবে না। রাজনৈতিক টানাপোড়নে এটা প্রত্যাশিত নয়। তবে আমি আশাবাদী। সরকার না হলে জনগণ এগিয়ে আসবেন ও আমরাও এগিয়ে যেতে পারব।

শরীফা বুলবুল : আপনি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে অধ্যাপনা করেছেন, অর্থাৎ জীবনের সামান্য সময় ছিলেন নিজের জন্মস্থানে, সেই সময়কার কিছু স্মৃতি মনে পড়ে কি ?

ডা. নুরুল ইসলাম : চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে অধ্যাপক হিসেবে আমিই প্রথম যোগদান করি। ফেব্রুয়ারী ১৯৬২ সাল। এম আর সিপি হিসেবে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে মেডিসিন বিভাগে আমিই প্রথম অধ্যাপক। এ ডিগ্রীর প্রতি তখন মানুষের একটা আকর্ষন ছিল।

কলকাতা মেডিকেল কলেজে আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক মনি দে ক্লাশ নিতেন সকাল সাতটায়। নিয়মিত ছাত্রছাত্রী ছাড়াও কিছু ডাক্তার তাঁর বক্তৃতা শুনতে আসতেন। রোল কল করা হত না। সবাইকে তিনি ঢালাওভাবে হাজিরা দিতেন। তবুও সেখানে কোনো ফাঁকি ছিল না। সকলে সময়মত তাঁর ক্লাশে ভিড় জমাত। শিক্ষক হিসেবে তার দক্ষতা, পারদর্শিতা এবং নিয়মানুবর্তিতা আমাকে উৎসাহিত করে। সিদ্ধান্ত নিলাম তাঁকেই অনুকরণ করব। ঘোষণা দিলাম ক্লাশে রোল কল হবে না। সবাইকে হাজিরা দেয়া হবে। ইচ্ছা হলে কেউ না এলেও চলবে। আমার বক্তৃতা শোনার যাদের ইচ্ছে তারাই শুধু আসবে। লেকচার গ্যালারি সবসময় ভরপুর থাকত। আমি তৃপ্তি পেতাম। কিছু কিছু ছাত্র এগিয়ে এল একাডেমিক কর্মসূচি যেমন- পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান, জার্নাল প্রকাশনা ইত্যাদি নিয়ে। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের সাময়িকী প্রকাশের ব্যবস্থা নেয়া হল। জার্নাল প্রকাশের দায়িত্ব নিলাম নিজ হাতে। আমি নিজেই এর নামকরণ করলাম 'চমক' অর্থাৎ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ। সাময়িকী সময়মত প্রকাশিত করা হল। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে আমার দৈনন্দিন কর্মকান্ড এবং অতি অল্প সময়ের সফলতায় উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের থেকে যেন উৎসাহের পরিবর্তে বাধার সম্মুখিন হয়েছি। স্বীকৃতির পরিবর্তে অপরাধী বলে বিবেচিত হয়েছি। আমার বার্ষিক এ.সি আর-এ অধ্যক্ষ সাহেব লিখলেন যে, আমি ছাত্র রাজনীতিতে জড়িত। হাসপাতালের প্রশাসক লিখলেন, আমি একজন সুদক্ষ শিক্ষক এবং চিকিৎসক। নিজ জেলা চট্টগ্রামে আমার অবস্থান সুদীর্ঘ না হলেও এখানকার স্মৃতি মধুময় ও অম্লান।

শরীফা বুলবুল : আপনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন, সংসার জীবন শুরু করলেন, এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

ডা. নুরুল ইসলাম : চিকিৎসা পেশায় একমাত্র আমিই এম.আর.সি.পি ডিগ্রীধারী অবিবাহিত যুবক। বিয়ের বাজারে কড়া দাম। দু'একটি উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের

মাতাপিতা থেকে আমার কাছে প্রস্তাব এসেছিল সরাসরি, কোনো মাধ্যমে নয়। আবার-দু'একজন প্রস্তাব দিয়েছিল মামা ইকবালুর রহমানের মাধ্যমে। নিজেদের মেয়েকে রোগী হিসেবে এনে দু-একজন মহিলা নানা অজুহাতে আমার মায়ের সাথে দেখা করতে যেতেন। অধ্যাপক হিসেবে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে যোগদানের পর ফজলুল কাদের চৌধুরী সাহেবের সান্নিধ্যে আসি আরো গভীরভাবে তিনি ছিলেন আমার পরম হিতৈষী। আমার মায়ের প্রতি তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। একদিন তিনি আমাকে প্রস্তাব দিলেন, চট্টগ্রামের অন্যতম জমিদার এয়ার আলী খাঁনের (পেঁচুমিয়া) মেয়ের জন্য। আমার প্রতিক্রিয়া গোপন রেখে কোনো জবাব দিইনি। কয়েকদিন পর যখন আবার দেখা হয় তিনি আমার মতামত জানতে চাইলেন। বললাম, এরা জমিদার পরিবারের। আমরা বড়লোক নই। আমার মা সহজ সরল গ্রামের মেয়ে। লেখাপড়া জানেন না। আমার ভয় হয় এমন এক পরিবারের উচ্চ শিক্ষিত মেয়ে তাঁর প্রতি যদি শ্রদ্ধাশীল না হয় ...। আমার কথা শেষ না হতেই তিনি বললেন, আমি বুঝেছি। আর বলতে হবে না। যা হোক বিয়ের প্রস্তাব আসতেই থাকে। ওয়াদুদ এবং অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের মাধ্যমে মা প্রায় বিয়ের কথা বলেন। ওয়াদুদ আমার ওপর বিয়ের বোঝা চাপিয়ে দিতে আগ্রহী। বয়সে আমার সমসাময়িক হলেও ইতোমধ্যে সে তিন ছেলে মেয়ের বাবা। রাজশাহীতে থাকাকালীন ইংরেজীর অধ্যাপক মোহাম্মদ আলীর সাথে তার পরিচয় হয়। পরে সম্পর্ক ঘনিষ্ট হয়। কথায় কথায় ওয়াদুদ জানতে পারল তার বড়বোন আনোয়ারা ময়মনসিংহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজে শিক্ষকতা করেন। তবে এখন বিয়েতে আগ্রহী নন। উচ্চ শিক্ষায় বিদেশে যাবার পথে। ঢাকায় এসে ওয়াদুদ যখন ব্যাপারটা আমাকে জানাল, আমি বললাম, ভালো কথা। আমিও বর্তমানে এ দায়িত্ব নিতে রাজি নই। তবে এও হতে পারে পরে এক সময় আমরা দুজনই রাজী হব।

বছর কয়েক পর আনোয়ারা উচ্চ শিক্ষা শেষে দেশে ফেরেন। আর আমি অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্তি লাভের পর চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে বদলী হয়েছি। ওয়াদুদ নতুন করে অধ্যাপক মোহাম্মদ আলীর কাছে প্রস্তাব নিয়ে গেলে তিনি মুরুব্বিদের সাথে আলাপ করে আনোয়ারার সম্মতি নিলেন। আমিও রাজী হলাম। ইতোমধ্যে আনোয়ারা ঢাকা শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্রে বদলী হয়ে এসেছেন। ঠিক করা হল বিয়ে ঢাকাতেই হবে।

গুজব শুনে কয়েকটি মহল আমার পক্ষে প্রচার অভিযান শুরু হল। আজগুবি কাহিনী প্রচার হতে লাগল। আমি নাকি মদ-খাই। আমার নাকি মনোনীত পাত্রী আছে। যেখানে সেখানে পড়ে থাকি। আনোয়ারার জীবনে নাকি অনেক কেলেঙ্কারী, এগুলো শুনে মনে মনে হাসতাম। ওয়াদুদকে নাকি আনোয়ারার আব্বা বলেছিলেন আমি বদমেজাজি, গোঁয়ার প্রকৃতির বলে তিনি শুনেছেন। তাই একটু ভয় করেন। জবাবে সে বলেছিল যদি তাই হয় তাহলে আমার কাছে রোগীর এত ভিড় কেন। মাত্র দু'এক বছরে এত জনপ্রিয়

চিকিৎসক হলাম কী করে! এগুলো স্বার্থপর মহলের প্রচারণা। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হল ডিসেম্বরের ২৬ তারিখ ১৯৬২ সাল বিয়ে। ঢাকা ধানমন্ডি সেন্ট্রাল রোডে তখন আমার বর্তমান বাসস্থান 'গুলমেহের'ই ছিল একমাত্র বাড়ি। মায়ের নামেই এ বাড়ি। তখন এটা দোতলা ছিল। পেছনে কর্নেল এম এ হকের জায়গা ও বিরাট খেলার মাঠ। ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রসুতি বিভাগের অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম ছিলেন আমার পরম আত্মীয়ের মতো। তিনি ১১১ নং গ্রিন রোডের বিরাট এক বাড়িতে থাকতেন। চাকরি জীবনের বিপর্যয়ে যেমন অধ্যাপক নুরুল ইসলামের সাহায্য পেয়েছি বিয়ের দিনেও তাকে পেয়েছিলাম অতি আপনজন হিসেবে। আমার আকদ হয় তার বাড়িতেই। আর খানাপিনার আয়োজন করা হয় আমার বাড়ির উত্তর পার্শ্বে কর্নেল হকের জায়গায়। শ্বশুরবাড়ি থেকে শেরওয়ানি, মশারি, খাট-পালং ইত্যাদির টাকা ঠিক সময়ে ওয়াদুদের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। দরজি সময়মত শেরওয়ানী দেয়নি। এদিক কারো নজর পড়েনি। বিয়ের দিন কাপড় পরার সময় দেখা গেল এটা নেই। ধোলাই করতে দেয়া হয়েছে। দোকানে গিয়ে দেখা গেল ধুয়ে আসেনি। ধোপার দোকানে কাপড়ের অভাব নেই। সে আমার মাপের একটা শেরওয়ানীর ব্যবস্থা করল। মাত্র-সাত-আট ঘন্টার ব্যাপার। ফেরত পেলেই হল। কে জানবে এ শেরওয়ানী আমার কিনা।

এ শেরওয়ানী, নাগরাজুতা, পাগড়ি, পরার পর সবাই বলল 'রাজপুত্রের মতো দেখাচ্ছে।' শেরওয়ানীটাও বেশ ভালো তৈরী করেছে। সবাই বলতে থাকল এটা কোন দর্জির ? আমি চুপ থাকি। মনে মনে হাসি। প্রথম রাতেই স্ত্রীকে বললাম 'মা' ছাড়াও আমার বড়ভাই, ভাবী এবং মামা এ কয়জনের দান জীবনে কোনদিন শোধ করতে পারব না। তুমি তাদেরকে আমার চোখে দেখবে, শ্রদ্ধা করবে। এ অনুরোধ আনোয়ারা কোন দিন উপেক্ষা করেনি।

জামাল উদ্দিন : আমরা এখন জানতে চাচ্ছি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে। এ মহান বাঙালি কবি কলকাতা থেকে বাংলাদেশে যেদিন পা রাখলেন সেদিন থেকে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আপনিই ছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক, তাঁকে আপনি কাছ থেকে দেখেছেন, কবে কখন কিভাবে কার উদ্যোগে তিনি বাংলাদেশে আসলেন এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাচ্ছি ...

ডাঃ নুরুল ইসলাম : ১৯৭২ সালের মে মাসের মাঝামাঝি বঙ্গবন্ধু যখন কবি নজরুলকে বাংলাদেশে নিয়ে আসার পরিকল্পনার কথা আমাকে জানালেন, তখন আমি আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলাম। অন্যমনস্কতাহেতু কবিকে দীর্ঘদিন পূর্বে দেখার যে সুযোগ আমি হারিয়েছিলাম, সে বেদনা এবার প্রশমিত হবে বলে আশ্বান্বিত হলাম। ২/১ দিনের মধ্যে সরকারীভাবে জানানো হল কবিকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে আসা হবে। প্রস্তুতি-পর্ব সম্পন্ন হলে তাঁর চিকিৎসার ভার তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটির উপর ন্যস্ত করা হয়। আমাকে করা হয় সেই কমিটির চেয়ারম্যান। কমিটির অপর দু'জন

সদস্য হলেন অধ্যাপক নাজিম-উদ্-দৌলা চৌধুরী এবং অধ্যাপক আবদুল মান্নান। কবিকে দেখবার এবং সেবা করবার এই অপ্রত্যাশিত সুযোগ আমরা সকলেই গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে সানন্দে গ্রহণ করি।

২৪ মে, ১৯৭২ সাল। বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। বাংলাদেশ বিমানের একটি ফকার ফ্রেন্ডশিপে কবিকে ঢাকায় নিয়ে আসার পর বিমান বন্দর থেকে কবিকে সরাসরি পূর্ব নির্ধারিত ধানমন্ডির ২৮ নং রোডের একটি বাড়িতে নিয়ে যাওয়া সাব্যস্ত হল। নির্ধারিত এ্যাম্বুলেন্সে করে একজন সেবিকা এবং সহযোগী ডাক্তার নিয়ে আমি যথাসময়ে বিমানবন্দরে পৌছি। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। সাড়ে এগারটা নাগাদ বিমান অবতরণ করার কথা। আমরা পৌছি এগারটায়। দেখলাম বিমান বন্দর বিশাল জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, ছাত্রনেতা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ।

১১টা ৪০ মিনিটে কবিকে নিয়ে ফকার ফ্রেন্ডশিপ বিমানটি বিমানবন্দরে অবতরণ করে। সাথে সাথে বিশাল জনতা বিভিন্ন শ্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলে। নিরাপত্তা বেষ্টনী তখন অস্তিত্বহীন। শত শত উৎসুক জনতা বিমানের চারপাশ ঘিরে ফেলে। প্রায় ১৫/২০ মিনিট ধরে চেষ্টা করেও পুলিশ জনতাকে বিমান থেকে সরাতে ব্যর্থ হয়। কবির জ্যেষ্ঠপুত্র কাজী সব্যসাচী মাইক্রোফোনে জনতাকে দূরে সরবার জন্য অনুরোধ জানান অনেক কষ্টে আমি এ্যাম্বুলেন্স নিয়ে বিমানের সামনের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে যাই। কবিকে কোন মতে এ্যাম্বুলেন্সে তোলার সাথে সাথে জনসমুদ্র থেকে অবিরাম পুষ্পবৃষ্টি শুরু হয়। হর্ণ বাজাতে বাজাতে কোনক্রমে এ্যাম্বুলেন্স বিমান বন্দরের বাইরে আসতে সক্ষম হয়। একই বিমানে কবির সাথে যারা এসেছিলেন, তাঁরা হলেন কবি পরিবারের সদস্য। এরা ছিলেন সংখ্যায় ১৫ জন। কাজী সব্যসাচী, তার স্ত্রী উমা কাজী, কাজী অনিরুদ্ধ, তার স্ত্রী শ্রীমতি কল্যাণী কাজী, কবির পৌত্র-পৌত্রী মিষ্টি কাজী, খিল খিল কাজী,মাস্টার বাবুল কাজী, কাজী অনিন্দিতা, কাজী অনিবার্ণ প্রমুখ।

অবশেষে আমরা ধানমণ্ডিস্থ ২৮নং রোডের নির্ধারিত বাড়ীতে পৌছি। দেখি এখানেও জনসমাগম। যা হোক, এ্যাম্বুলেন্স থেকে ধীরে ধীরে নামিয়ে কবিকে বিছানায় শোয়ানোর পর আমরা তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করি এবং বিভিন্ন নির্দেশ দিই। বেশী লোক দেখলে কবি বিরক্ত বোধ করেন তাই ভীড় না করার জন্য আমরা সবাইকে অনুরোধ করি। ভ্রমণের ফলে কবি কিছুটা ক্লান্ত ও অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। শারীরিক এবং মানসিক বিশ্রামের জন্য আমরা তাঁকে ঘুমের ওষুধ দিই। তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েন।

পরের দিন ১১ই জ্যৈষ্ঠ। কবির ৭৪তম জন্ম বার্ষিকী। রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রি পরিষদের সদস্যবর্গ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীসহ বিভিন স্ত রের লোক এসেছিলেন কবিকে শ্রদ্ধা জানাতে। প্রত্যেকে নিয়ে এসেছিলেন ফুলের মালা। অনেক কণ্ঠশিল্পী কবিকে সেদিন গান গেয়ে শোনান। দুপুর ১২ টা থেকে বিকেল ৪টা

পর্যন্ত বিশ্রামের জন্য কবিকে আলাদা করে রাখা হয়।
পূর্ব পাকিস্তান সরকার শেষ পর্যায়ে কবিকে পাঁচশত টাকা মাসিক ভাতা দিত।
বাংলাদেশ সরকার ঐ দিন কবিকে মাসিক ভাতা এক হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে বলে ঘোষণা করে।
বিকেল বেলায় আবার বিরাট সুধী সমাগম হয়। বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী ফেরদৌসী রহমান, ফিরোজা বেগম এবং আরও অনেকে কবিকে গান গেয়ে শোনান। সেদিন কবিকে উৎফুল্ল দেখাচ্ছিলো।
এমনিভাবে শুধু জন্মদিনে নয়, প্রতিদিন সকাল, দুপুর বহু ভক্তের সমাগম হতে থাকে কবির এই নতুন গৃহে। মুগ্ধ দর্শকের দিকে তাকিয়ে কবি কখনও হাসেন, কখনও বিরক্তি প্রকাশ করেন।
উমা কাজী কবি-সেবক শাহু এ দু'জন সবসময় কবির পরিচর্যায় থাকতেন। প্রায় প্রতিদিন কখনও কখনও ২/১ দিন পর পর আমরা কবির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে দেখতাম। কখনও কখনও অতি আগ্রহে নিতান্ত উৎফুল্ল মনে কবির গুণগ্রাহীদের কেউ কেউ জানতে চাইতেন কবি কখন বাক্‌শক্তি ফিরে পাবেন। মাঝে মাঝে গুজব রটত-কবি আরোগ্যের পথে। আমরা ব্যতিব্যস্ত হতাম। কবির ব্যধির প্রকৃতি এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শুরু থেকেই আমরা অবহিত ছিলাম। অত্যন্ত বেদনায়দায়ক হলেও আমরা তখন নিজেদের নিতান্ত অসহায় মনে করতাম।
আনন্দ-বেদনার মাঝ দিয়ে প্রায় তিন বৎসর কেটে গেল। পরবর্তী পর্যায়ে দেখা গেল কবির আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব যাঁদের উপর কবির পরিচর্যার ভার ছিল, তারা ধীরে ধীরে দূরে সরে পড়েছেন। বিভিন্ন সময়ে ছোট খাট উপসর্গের জন্য যতটুকু মনোযোগের দরকার,কবি তা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন। এমনকি খাওয়া দাওয়া এবং বিছানাপত্রের মান ক্রমে অবনতির দিকে। এসব ব্যাপার বঙ্গবন্ধুর গোচরে এলে তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে বললেন, এত সুযোগ সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও কবি যতটা সেবা পাবার কথা তা পাচ্ছেন না। বরং তাঁকে উপলক্ষ করে অনেকে ফায়দা ওঠাচ্ছেন। তিনি বললেন, এভাবে চললে কবি বেশী দিন বেঁচে থাকতে পারবেন না। এমন একটা ব্যবস্থা করতে হবে যেখানে চাটুকারের স্থান থাকবে না। চিকিৎসা এবং সেবার কোন অভাব হবে না। কবি তাঁর জন্য যতটুকু সেবা পাবার প্রয়োজন, অন্তত তা পাবেন। এজন্য উপযুক্ত হবে হাসপাতালের একটা কেবিন।
যে পরিস্থিতিতে কবি দিন কাটাচ্ছিলেন, এর থেকে রেহাই পাবার জন্য এটাই ছিল একমাত্র বিকল্প ব্যবস্থা। আমি সঙ্গে সঙ্গে এর স্বপক্ষে রায় দিলাম। বঙ্গবন্ধু নির্দেশ দিলেন,কবি যতদিন বেঁচে থাকবেন, ততদিন যেন হাসপাতালেই কাটাতে পারেন এ ধরনের সুব্যবস্থাই করতে হবে। ভেবে চিন্তে কবিকে পি.জি'র ১১৭নং কেবিনে রাখা হবে বলে স্থির করলাম। এটা ছিল দোতালার একপাশে। পাশে ছিল বারান্দা এবং

সেবিকাদের প্রধান মেট্রোনের অফিস। দিনটি ছিল ১৯৭৫-এর ২৩ জুলাই। সকালবেলা কবিকে স্থানান্তরিত করা হয় কেবিনে। সেবিকা, ডাক্তার কে কখন কবিকে দেখবেন এর রোস্টার তৈরি করে দেয়া হল। ধানমন্ডির বাসায় নিযুক্ত চৌকিদার মুজিবর রহমানও সঙ্গে এসেছিলেন। কবির পুত্রদ্বয় তখন কলকাতায়। এদিকে উমা কাজীও কাছে নেই। বিয়ে করে তিনি নতুন সংসার করছেন। আছে শুধু কিশোর শাহু। হাসপাতালে কবিকে সবাই অতি আপনজন হিসাবে গ্রহন করেছিলেন। স্টুয়ার্ট সৈয়দ নাসির আলি, মেট্রোন ইরশাদ বেগম, সুপারিনটেনডেন্ট, এ. আর. খান এঁদের সকলের কাছে কবি ছিলেন একান্ত আপনজন। পরিবর্তিত পরিবেশে কবির স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হয়। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে কবির কোন অনীহা ছিলনা। বরং অতি তৃপ্তির সাথে শান্তভাবে তিনি খাওয়া দাওয়া করতেন। লোকজনের ভীড় এখানেও তেমন কম ছিল না। তবে হাসপাতাল বিধায় বাধ্যবাধকতা হিসাবে সেটা ছিল সুশৃংখল। কোন কোন শিল্পী কবিকে মাঝেমাঝে গান শোনাতেন। এছাড়া ব্যবস্থা ছিল কবির নিজস্ব গানের ক্যাসেট বাজানোর। মাঝে মাঝে কেবিনের ভিতর পায়চারী করতেন তিনি, কখনও কেবিনের বারান্দায়। উদাস দৃষ্টি মেলে কখনও চেয়ে থাকতেন দূর আকাশের নীলিমায়। কি যেন ভাবতেন তিনি। মাঝে মাঝে কিছু একটা বলার চেষ্টা করতেন। অস্পষ্ট শব্দ বোঝা যেত না। অনেকবার বোঝার চেষ্টা করেছি। আমার সে সব চেষ্টা বার বার ব্যর্থ হয়েছে।

কবির অপছন্দের মাঝে যেটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি, সেটা হল চশমা। মনে পড়ে প্রথম দিন যখন চশমা চোখে কবিকে দেখতে যাই, তখন তিনি অত্যন্ত বিরক্তির সুরে বিকট শব্দ করেছিলেন। আমার কাছে সেটা মনে হয়েছিল "বেরিয়ে যাও।" এ হয়ত আমার কাছে একটা আবেগময় কল্পনা। তবে শব্দটা যে বিরক্তির চাহনিতেই সেটার প্রকাশ পেয়েছিলাম। তখন থেকে কবিকে দেখতে যাবার সময় চশমা সম্বন্ধে সচেতন থাকতাম। মনে হত তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিল গান, কাগজ আর কলম। যে কোন কাগজ হাতে দিলে তিনি দু'হাতে ধরে চোখ বুলাতেন। মনে হতো যেন অতি স্বাভাবিকভাবে পড়ে যাচ্ছেন। কিন্তু কয়েক মুহূর্তেই এই ভুল ভেঙ্গে যেত। চোখ বুলানো শেষ হলে কাগজটাকে তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। কলম তিনি সব সময় হাতে তুলে নিতেন। এক নজর দেখতেন। তারপর তাও ছুঁড়ে ফেলে দিতেন।

প্রতিদিন সকালে একবার এবং রাতে আর একবার কবিকে দেখা আমার দৈনন্দিন স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। আমাকে দেখলেই কবি খুশী হতেন। হাতে হাত মেলাতে গেলেই তিনি হাত বাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করতেন। আমি তার নাড়ি দেখতাম। সেবিকাকে জিজ্ঞেস করে আমার যা জানার তা জেনে নিতাম।

শরীফা বুলবুল : জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম ছাড়াও আপনি স্মরণীয় বরণীয় অনেক বাঙালি মনীষীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন। এঁদের অনেককে আপনি পিজি

হাসপাতালে রেখেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন এ সম্পর্কে একটু স্মৃতিচারণ করুন..

ডা. নুরুল ইসলাম : আমি তখন কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র– ১৯৪৫ সালের শেষের দিক। পাকিস্তান আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে। ওয়েলেস্‌লি স্কোয়ারে মুসলিম ইনস্টিটিউটে এক সভার আয়োজন করা হয়েছে। প্রধান বক্তা কে ছিলেন মনে নেই। তবে সঙ্গীতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন পল্লীগীতি-সম্রাট আব্বাসউদ্দীন। নজরুলের কয়েকটি গানই তিনি গেয়েছিলেন। কথাগুলো এখনো কানে ভেসে আসে। প্রথম গানটি ছিল 'চল্ চল্ চল্।' শ্রোতাদের ঘন ঘন করতালি এবং 'আরো একটি, আরো একটি' অনুরোধেই তিনি কয়েকটি গান করলেন।

পেশা জীবনে তাঁকে চিকিৎসা করার সুযোগ আমার হয়। অবশ্য যে-রোগে তিনি আক্রান্ত হন তার কারণ এবং ওষুধ কোনোটাই এখনো আমাদের জানা নেই। প্রকৃতির কী অদ্ভুত পরিহাস। যে কণ্ঠের সুললিত ঝঙ্কার নজরুল সঙ্গীতকে জ্বালাময়ী রূপ দিয়েছিল, মুসলিম জাগরণে অপূর্ব অবদান রেখেছিল, আব্বাসউদ্দীনের শেষ দিনে সে কণ্ঠ শক্তি হারাল। হয়তোবা সেটা ছিল নিয়তির বিধান; কর্ম শেষে বিশ্রামের পালা। রোগটা ছিল প্রগ্রেসিভ মাসকুলার এট্রফি–মোটর নিউরোন ডিজিজের একটি রূপ।

মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর চিকিৎসার প্রথম সুযোগ হয় ১৯৬৫ সালে-আমি যখন মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুলে প্রভাষক। পরবর্তী প্রায় তিন যুগের কাছাকাছি সময় তাঁর অসুখ-বিসুখে আমার ডাক পড়ে। যে-অবস্থায় যেখানেই থাকুন-না কেন তাঁর আতিথেয়তা বলতে গেলে বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করতে হয়েছে। মুক্ত অবস্থায় যেমন তিনি দুহাতে অনেক খাবার তুলে দিয়েছেন, বন্দিদশায় তেমনি দু-একটি সন্দেশ কয়েকজনের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। পুলিশ, পিয়ন, ড্রাইভার কেউ বাদ পড়েনি।

এক সকালে মাওলানা সাহেবকে সন্তোষে দেখার অনুরোধ আসে। কয়েকদিন ধরে তিনি অসুস্থ। ঢাকায় আসতে নারাজ। গিয়ে দেখি তিনি পেটের অসুখে ভুগছেন, কিছুটা দুর্বল। রোগের কাহিনী শোনার পর তাঁকে পরীক্ষা করে দুটো ওষুধ লিখে দিই। জানা গেল এগুলো ওখানে পাওয়া যায় না, ঢাকা থেকে পাঠাতে হবে। কথা দিলাম আমি যোগাড় করে রাখব, কেউ-না কেউ যেন নিয়ে আসেন।

মাওলানা সাহেবের প্রচলিত নিয়মে আমরা যে-কজন তাঁর আশেপাশে ছিলাম সবার জন্য চা-নাশতা এল। যাহোক এমন সময় তাঁর বড় ছেলে আবু নাসের খান ভাসানী একটা বড় রুইমাছ হাতে নিয়ে ঘুরে ঢুকলেন। একজন জেলে বিক্রি করার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল। দাম ২০০ টাকার মতো মাওলানা সাহেব কিনতে বললেন। পকেট থেকে মানিব্যাগ নিয়ে তিনটে একশ টাকার নোট বের করে বললাম, 'হুজুর, আপনি অনুমতি দিলে টাকাটা আমি দেব।' সাথে সাথে জবাব, 'নুরুল ইসলাম, তোমার টাকা রেখে দাও। আমি জানি, ডাক্তার হিসেবে এ টাকা রোজগার করতে তোমার কষ্ট হয়। আমার তা হয় না। ফুঁ

দিলেই টাকা!' তাঁর নির্দেশ মেনে নিতে বাধ্য হলাম।

সর্বজন শ্রদ্ধেয় মাওলানা আকরাম খাঁ ছিলেন দৈনিক আজাদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। তাঁর শেষ চিকিৎসা করার সুযোগ আমার হয়েছিল। একদিন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী ঢাকায় এলে আমি মাওলানা সাহেবকে দেখতে যাবার সময় তাঁকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সাথে নিয়ে গেলাম। পরিচয় জানতে চাইলে মাওলানা সাহেবকে বললাম, 'ইনি আমার ব্রাদার-ইন-ল মোহাম্মদ আলী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক।' মাওলানা সাহেব বললেন, 'ডাক্তার সাহেব, আপনার কথা শুনে লক্ষ্ণৌয়ের এক ঘটনা মনে পড়ে গেল। এক বন্ধুর বাড়িতে দাওয়াত ছিল। অতিথিদের সাথে তিনি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন। জনৈক ভদ্রলোকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন অসাধারণভাবে। বললেন, 'ম্যারা লড়কা ইনকো মামা ক্যাহাতাহ (অর্থাৎ আমার ছেলে এঁকে মামা বলে)। আপনিও তাই বলতে পারেন। শ্যালক বলতে লজ্জা করে বলে হয়তো ইংরেজিতে বললেন ব্রাদার-ইন-ল।' মাওলানা সাহেবের রসিকতায় আমরা হেসে ভেঙে পড়লাম। জটিল রোগে আক্রান্ত হয়েও তাঁর মনের জোর দেখে মুগ্ধ হলাম।

এম.আর.সিপি. পাস করে দেশে ফেরার পর যে-কজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে চিকিৎসা করার সুযোগ হয়েছিল তাঁদের একজন কবি জসীমউদ্দীন। হাতে পায়ে গাঁটে গাঁটে ব্যথা- রিউমাটয়েড আথ্রাইটস। ওষুধ দিলাম। ডিসপিরিন ট্যাবলেট, সবচেয়ে শস্তা। অবাক হয়ে বললেন,'এত শস্তা দামের জ্বরের ট্যাবলেট কি অসুখ ছাড়বে ডাক্তার সাহেব ?' জবাবে বললাম, 'শস্তা হলেও আপনার অসুখে এটাকে শ্রেষ্ঠ মনেকরি। বিশ্বাস করে নির্দেশ মতো খেতে থাকুন, উপকার না হবার কারণ দেখি না।' রাজি হয়ে চলে গেলেন। কয়েকদিন পর জানালেন বেশ ভালোই লাগছে। তারপর বেশ কিছুদিন খবর নেই হঠাৎ একদিন টেলিফোন এল তিনি দেখা করতে চান। সানন্দে অনুমতি দিলাম। সিদ্দিক বাজারে তাঁর বাসা থেকে মিটফোর্ডে আমার চেম্বারে আসতে বেশিক্ষণ লাগল না। অন্য রোগীর মাঝখানে অপেক্ষা করছিলেন। জানতে পেরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমার কামরায় ডেকে নিলাম। মাঝখানে বিলাত গিয়েছিলেন, সেজন্য এতদিন দেখা হয়নি। এখন অনেকটা সুস্থ। আমার দেয়া ওষুধই চলছে অর্থাৎ শুধু ডিসপিরিন। বিলাতে বিশেষজ্ঞ দুজন ডাক্তার দেখিয়েছেন। তাঁদেরও একই ওষুধ, একই উপদেশ। মনে মনে খুব খুশি হলাম, তবে অবাক হইনি। এরপর একদিকে যেমন তিনি ডিসপিরিন চালিয়ে যাচ্ছিলেন, অন্যদিকে তেমন আমার প্রচার-অভিযানে ঝুঁকে পড়লেন। পথে-ঘাটে, সভায়-অনুষ্ঠানে যখনি তাঁর সাথে দেখা হয়েছে, আশেপাশের সবাইকে বলতেন, 'এক ডিসপিরিন দিয়েই ডাক্তার সাহেব আমাকে ভালো করেছেন। বিলাতি নামী-দামী ডাক্তারও তাঁর প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী চিকিৎসা চালাতে বলেছেন। আমি মনেকরি এটা আমাদের জন্য গৌরবের।

ডিসপিরিন দিয়ে পল্লীকবির সাথে প্রথম পেশাগত সংস্রব। জীবনে শেষ-মুহূর্ত পর্যন্ত আমার ওপর তাঁর বিশ্বাস ছিল অটল। একে একে পরিবারে সকলকেই আমার হাতে সঁপে দিয়েছিলেন। বেগম জসীমউদ্দীন এবং তাঁর পরিবারের সবাই, এমনকি উপরাষ্ট্রপতি বর্তমানে আইনমন্ত্রী মওদুদ আহমদ ও তাঁর সুযোগ্য স্ত্রী হাসনা মওদুদ চিকিৎসার ব্যাপারে আমার মতামত নেবেনই। কোনো কারণে চিকিৎসক যিনিই হোন-না কেন।

আরো যে-কজনের কথা মনে পড়ে তাঁদের সবার আগে যাঁর স্থান তিনি হলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন। বহুকাল ধরে তাঁকে আদেশ দিয়েছি, অনুরোধ করেছি, এ বিষপান বিসর্জন দিতে। তিনি পারেননি। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল ফুসফুসে দূরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন। পি.জি.তে. ২৪২ নং কেবিনে ভর্তি। ধীরে ধীরে চোখের সামনে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন। পরিবার-পরিজন সবাইকে জানানো হল। এ রোগ সারবার নয়। দু-একজন উৎফুল্ল হয়ে জানালেন তিনি ধূমপান বন্ধ করেছেন। নিজেও একদিন সবার সামনে ঘোষণা দিলেন। আমাকে সঙ্গে নিয়ে ছবি তুলতে বললেন আমেরিকা থেকে আগত তাঁর বড়ছেলে সাইফুল আবেদীনকে। হয়তোবা ভেবেছিলেন আর সুযোগ হবে না। একই সময়ে কবি নজরুল, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক আবদুল গণি হাজারী, কবি জসীমউদ্দীন পি.জি-তে আমার তত্ত্বাবধানে ভর্তি। ১১৭ নং কেবিনে সবার একসাথে ছবি তোলা হল তাঁরই ইচ্ছায়। শিল্পী জানতে পেরেছিলেন জীবনের আর বেশিদিন বাকি নেই। তিনি যেমন তুলি দিয়ে আপন কল্পনাকে ধরে রাখেন, আমরা যেন ছবি দিয়ে তাঁকে ধরে রাখি। অবশেষে ২৮মে ১৯৭৬ সালে শিল্পী জয়নুল আবেদীন অসামান্য কৃতি রেখে চিরতরে চলে গেলেন। প্রমাণ রেখে গেলেন নিঃশব্দ আততায়ী ধূমপান আত্মীয়-অনাত্মীয় বিচার করে না। গুণীজনের সম্মান দিতে জানে না। শুধু জানে অকালে জীবন ছিনিয়ে নিতে। আমার সবচেয়ে বুড়ো রোগীর বয়স ১০২। সাংবাদিক জগতে তিনি এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। বড় মজার লোকই বটেন। তিনি 'সওগাত'-সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন। তাঁকে দাওয়াত দিয়েছিলাম আমার বাড়িতে। সঙ্গে ছিলেন অধ্যাপক মনসুর উদ্দীন এবংসুফী জুলফিকার হায়দার। তিন তলায় থাকি। আর কারো না হোক, নাসিরউদ্দীন সাহেবের অসুবিধে হবে ভেবে নিচ তলায় একটা বেতের চেয়ার নিয়ে স্বাস্থ্যবান দুজন ছেলেকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলাম। সাথে সাথে তিন তলায় না উঠালে হয়তো মনোক্ষুণ্ণ হবেন। গাড়ির শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি নিচে এসে দেখি তিনি পায়ে হেঁটে কয়েক সিঁড়ি উপরে উঠে গেছেন। চেয়ার দেখিয়ে বললাম সেটা তাঁর জন্য রাখা। তা নাহলে কষ্ট হবে। আমার কথা শুনলেন না। রেলিং-এ হাত দিয়ে তিন তলায় উঠে গেলেন। পরাজয় মেনে নেননি। তাঁর চিকিৎসক হিসেবে কিছুটা গর্ববোধ করলাম। একযুগ তাঁকে চিকিৎসা করার সুযোগ হয়েছে। অসুখ কমই হয়। ওষধুও দিই খুব কম। সাধারণত একটি ক্বচিৎ দুটো। আবার অনেক সময় কিছুই না। তিনি বলেন, 'ডাক্তার

সাহেব, আমার দেহযন্ত্রটি অনেক পুরনো। এতদিনের ব্যবহারে ক্ষয় হয়েছে অনেক। আপনি নতুন করে চালাবেন কী করে ? তবে ছোটখাটো মেরামত করে কোনো রকমে চালিয়ে দেয়া যাবে। বেশি ওষুধ দিলে গণ্ডগোল লাগতে পারে। আপনার সামান্য ওষুধে অনেকটা উপকার পাই বলে আসি। আগে দু-এক জায়গায় গিয়ে দেখেছি আট-দশটি ঔষুধ দেয়। পেটে অত জায়গা কোথায় ? তাছাড়া বিনা প্রয়োজনে নাটবলটু লাগালে যন্ত্রের গণ্ডগোল হবে না ?'

নাসিরউদ্দীন সাহেবের উক্তি তাৎপর্যপূর্ণ। জীবনের ক্ষয় আমাদের মেনে নিতে হবে। ওষুধের অপব্যবহার কিংবা যথেচ্ছ ব্যবহার সমূহ ক্ষতিসাধন করতে পারে। মনোবল দেহের শক্তি যোগায়। সুস্থ মন দেহের সহায়ক। এমনকি সব অসুখে ওষুধ লাগে না। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন এসবের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

১৯৬৫ সালে ডিসেম্বর মাসে মাওলানা তর্কবাগীশ উচ্চ রক্তচাপে ভুগছিলেন এবং এ কারণে মাথায় রক্ত জমাট হলে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। বলা যায় তখন তাঁর মুমূর্ষু অবস্থা। এ সময় বনগ্রাম লেনে তাঁর বাসায় ডাক পড়ে। আমিও দু-একজন সহযোগী নিয়ে পরীক্ষা করে ব্যবস্থাপত্র দিই। যতদূর মনে পড়ে আগের দেয়া সব ওষুধ বন্ধ করে শুধু ডিসপিরিন ও ভিটামিন দেয়া হয়েছিল। ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। এরপর সারাজীবন স্বাস্থ্যগত সব ব্যাপারে আমার উপদেশ নিতেন।

জীবনের শেষ-মুহূর্তগুলো তিনি পি.জি.-তে আমার চিকিৎসাধীন ছিলেন। পি.জি. থেকে অবসর গ্রহণের পূর্বে হাসপাতালে তিনি ছিলেন আমার শেষ শীর্ষস্থানীয় রোগী। বায়ান্নের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে মাওলানা তর্কবাগীশ যে স্বদেশপ্রেম ও বাঙলা ভাষার প্রতি মমত্ববোধ দেখিয়েছেন সে-কথা ভাবতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জাগে। তাঁকে চিকিৎসার সুযোগ আমার এবং আমার সহকারীদের কাছে ছিল গৌরবের।

রাজনীতির ক্ষেত্রে অবশ্য মোনায়েম খান একজন বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। অনেকে তাঁকে অত্যাচারী বলেও অভিহিত করেন। তাঁর জীবনের শেষ-মুহূর্তগুলো অত্যন্ত বেদনার। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসার পর তাঁকে দেখবার জন্য তাঁর জামাতা শরফুল আলম (সি.এস.পি) আমাকে টেলিফোনে অনুরোধ করেন। এ ব্যাপারে অধ্যাপক মো: আসির উদ্দীন এবং অধ্যাপক ফজলে রাব্বিকেও অনুরোধ জানানো হয়। আমি সোজাসুজি মেডিকেল কলেজে উপস্থিত হই। একই সময়ে অধ্যাপক ফজলে রাব্বিও সেখানে পৌছেন। দুজন একই সাথে অস্ত্রোপাচার কক্ষের বাইরে মোনায়েম খানকে একটা ট্রলির উপর শোয়ানো অবস্থায় দেখতে পাই। একহাতে রক্তের বোতল লাগানো ছিল, অন্য হাত ধরে আমি তাঁর পালস্ দেখছিলাম। ডা.ফজলে রাব্বি বুক পরীক্ষা করছিলেন। বুলেটের ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণের সুঠাম দেহের অধিকারী মোনায়েম খানকে কিছুটা অস্থির এবং শঙ্কিত দেখালেও তিনি জ্ঞান হারাননি। মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর হাতের শিরা গুনছিলাম। তিনি বলতে লাগলেন, 'ডাক্তার

সাহেব, আপনাদের অনেক জ্বালাতন করেছি। অনেক অত্যাচার করেছি। আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। সকলেই যেন আমাকে ক্ষমা করেন।'

নিবিড় মনে আমি এবং ডা. ফজলে রাব্বি কথাগুলো শুনছিলাম। এ সময়কার আরো একটা দৃশ্য ভোলা যায় না। গভর্নর থাকালীন যাঁরা তাঁর চারপাশে ভিড় জমাতেন এবং নানা ধরনের ফায়দা লুটতেন তাঁদের কাউকে তখন দেখা যায়নি। জীবনের শেষ উক্তিতে নিজের অপরাধ স্বীকার করে তিনি যে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়েছিলেন ইসলামের দৃষ্টিতে তা বোধহয় যথেষ্ট ছিল।

শোচনীয় মুহূর্তে চাটুকারেরা কেউ কাছে থাকে না, মোনায়েম খানের বন্ধুবিহীন নিঃসঙ্গ মৃত্যুবরণ সে-সত্যই প্রমাণ করে।

অধ্যাপক আবুল ফজল বহু বছর ধরে উচ্চ রক্তচাপে ভুগছিলেন। তাঁর চিকিৎসার দায়িত্ব আমার ওপর ছিল। চিকিৎসকের উপদেশ তিনি পুরোপুরি মেনে চলতেন। তার সহধর্মিণী উমরতুল ফজলেরও ছিল আমার ওপর অগাধ বিশ্বাস। উপযুক্ত জীবন সঙ্গিনীই বটেন। এখনো মাঝে মাঝে তাঁর চিকিৎসার সুযোগ আমার হয়। অধ্যাপক আবুল ফজলের অনেকগুলো বই উপহার-স্বরূপ পেয়েছি। এ উপহারও আমার কাছে পরম আনন্দের স্মৃতি।

জামাল উদ্দিন : আমাদের এরশাদ সাহেব তো ৮/৯ বছরের মতো ক্ষমতায় ছিলেন- তার সময়টা একটু মূল্যায়ণ করুন।

ডাঃ নুরুল ইসলাম : এরশাদ সাহেবের কতগুলো গুণ আছে। তিনি ভীষণ বুদ্ধিমান, খুবই ভদ্র, তিনি শিক্ষিত লোকদের খুব সম্মান করতেন, এই তিনটাই তাঁর গুণ।

জামাল উদ্দিন : তাহলে স্বৈরাচারী আখ্যায়িত হলেন কেন ?

ডাঃ নুরুল ইসলাম : সেটা কেন হল আমি জানিনা অবশ্য। তবে আমার মতে ঐ গুণগুলি তার ছিল।

জামাল উদ্দিন : ব্যক্তি এরশাদ সম্পর্কে কিছু বলুন ?

ডাঃ নুরুল ইসলাম : আমি তাকে যা দেখেছি তিনি খুব বুদ্ধিমান, এটা সবাই স্বীকার করে, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী-বিরোধী দলীয় নেত্রী এদের চাইতে তিনি অনেক বেশী বুদ্ধিমান। নয় বছর বাংলাদেশের মতো দেশকে চালানো কম কথা নয়।

শরীফা বুলবুল : কিন্তু তার এভাবে ভরাডুবি হলো কেন ? যদি এতই বুদ্ধিমান হন ? এবং স্বৈরাচারী হিসেবে তাকে আখ্যায়িত করলো সারা দেশ ?

ডাঃ নুরুল ইসলাম : স্বৈরাচার কেন বলছিলেন ?

জামাল উদ্দিন : রাজনৈতিক নেতারাইতো আখ্যায়িত করলো এখনো কথায় কথায় আমরা উল্লেখ করি স্বৈরাচারী এরশাদ- এটা কেন ?

ডাঃ নুরুল ইসলাম : স্বৈরাচারী কিংবা যা-ই হোক না কেন ব্যবহার তার ভালো ছিল , ভদ্র ছিল।

জামাল উদ্দিন : তার ব্যাপক নারী কেলেংকারী সহ...

ডাঃ নুরুল ইসলাম : তার জীবনে গ্রেটেস্ট ট্র্যাজেডি হল এটা। আমি নিজে মিসেস মোশারফ সাহেবের চিকিৎসা করেছি – সে নিজে ঘর ছেড়ে চলে গেল কেন !

জামাল উদ্দিন : তারপরে তো খালেদা জিয়া ক্ষমতাসীন হলো- ওরা ৫ বছর দেশ চালালো ওদের বিরুদ্ধে জনগণের যে ক্ষোভ...

ডাঃ নুরুল ইসলাম : যারা পাওয়ারে থাকে না তারা কেউ স্বৈরাচারী নয়। যারা পাওয়ারে আসে তারাই তাই করে। অন্য দলকে নিপীড়ন করে। যাকে তাকে এ্যারেস্ট করে। স্বৈরাচারের দেশ এটা। ব্যক্তি স্বৈরাচারী নয়। দেশটাই স্বৈরাচারী হয়ে গেছে।

জামাল উদ্দিন : এখন শেখ হাসিনার ভাষায় খালেদা জিয়া স্বৈরাচারী-খালেদার ভাষায় হাসিনা স্বৈরাচারী...

ডাঃ নুরুল ইসলাম : দু'জনই স্বৈরাচারী। আমি দুই জনকেই স্বৈরাচারী মনে করি। আজকে যে খালেদা জিয়া জিয়াউর রহমান সম্বন্ধে এতো বেশী বলে- হাসিনা কি বঙ্গবন্ধু সম্বন্ধে বেশী বলেনি ?

জামাল উদ্দিন : হাসিনা বঙ্গবন্ধু সম্বন্ধে বেশী বললেও কল্প কাহিনী তো বলেন নি ? এরা তো কল্পকাহিনী বানাচ্ছে এই যে জিয়ার মৃত্যুবার্ষিকীর দিন ?

ডাঃ নুরুল ইসলাম : কাহিনী কাহিনীই থাকে।

জামাল উদ্দিন : কাহিনী তো জেনুইন কাহিনী হতে হবে ?

ডাঃ নুরুল ইসলাম : কল্প কাহিনী বেশী উচিৎ ছিল না। আর হাসিনা যদি বঙ্গবন্ধুকে আওয়ামীলীগের নেতা না বলে জাতীয় নেতা বলতো তাহলে বেশী ভালো হতো। উনি জাতীয় নেতা হলে সবার কাছে সম্মানীত হতেন। সাথে সাথে জিয়াউর রহমান সাহেবকে যদি সম্মান দিতেন তাহলে এ অবস্থা হতো না। জিয়াউর রহমানের মৃত্যু দিবসেও সে যদি শোক দিবস পালন করতো, ছুটি বন্ধ- না করতো জিয়াউর রহমানের মাজারে গিয়ে যদি ফুল দিত, লোকে ওকে ফুল দিত। কোরান শরীফে একটা কথা আছে 'উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার'। ও যদি এতটুকু সম্মান করতো-খালেদা জিয়া অন্তত লজ্জা পেত বঙ্গবন্ধু সম্বন্ধে কিছু বলতে। এখন লজ্জা পায়না কেন ? যেহেতু ওরা করেছে ঐসব।

জামাল উদ্দিন : দেশের সাধারণ মানুষের মুক্তি কোথায় ...।

ডাঃ নুরুল ইসলাম : কোথাও নাই। দেশ যখন ধ্বংস হবে তখন সাধারণ মানুষ মুক্তি পাবে। এই দেশ থাকলে এই নোংরা রাজনীতি থাকবে। এই রাজনীতি থাকলে মুক্তি নেই।

জামাল উদ্দিন : আমার তো মনে হয় আপনাদের মতো গুটি কয়েক ব্যক্তিত্ব এখনো যদি রাজপথে নেমে আসেন এ সমস্যার সমাধান আপনারাই দিতে পারেন। আপনাদের সহযোগিতা করার লোক এখনো সমাজে আছেন- আপনারা কেন এক হতে পারছেন

না ?

ডাঃ নুরুল ইসলাম : সংঘবদ্ধ হওয়া এখানে মুশকিল, অনেকে ভয় করে- আমিও ভয় করি, যারা ভয় করে তাদের সংখ্যা বেশী। আমার কথা ধরা যাক, আমি যদি প্রতিবাদ করি কালকে আমার ইউনিভার্সিটি বন্ধ করতে চেষ্টা করবে। বঙ্গবন্ধু নাম দিয়েছি বলে আমাকে টাকা দে নাই। টাকা দিক না দিক নাম বদলানো হবে না। তবু আমাদের সাহস আছে বলে, লোকজনের সাহায্য আছে বলে, পারছি। বধ্যভূমি নিয়ে কি কি রকম কারবার চলছে দেখছেন না ? ত্রিশ বছর ধরে গরু ছাগল চড়তো সেখানে। আমরা সেখানে গিয়ে বাউন্ডারী ওয়াল দিয়ে যেই কাজ আরম্ভ করেছি- অনেক দূর কাজ এগিয়েছি তখন বলছে বধ্যভূমি ধ্বংস করতেছি।

জামাল উদ্দিন : যেমন আওয়ামী লীগ- শেখ হাসিনা আপনার খুব কাছের জন ছিলেন, তাঁর ৫ বছরের শাসনামল এবং ব্যক্তি শেখ হাসিনা সম্পর্কে ...

ডাঃ নুরুল ইসলাম : ব্যক্তি শেখ হাসিনা কেমন তাদের পতনেই তো বোঝা গেছে। আওয়ামী লীগ বেশী দাম্ভিক, নিজে সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস অতিরিক্ত পরিমাণে থাকতো- তাদের এই পতন হতো না। হাসিনা শুরুতে ঠিক ছিল আত্মীয় স্বজন থেকে মন্ত্রী না নিয়ে। ওর চাচী কেঁদেছে, আমাকে সে নিজে বলেছে- এই যে, শেখ সেলিম, শেখ সেলিমের মা বঙ্গবন্ধুর বড় বোন, তিনি নাকি খুব কেঁদেছেন যখন সেলিমকে মন্ত্রী করেনি। শেখ সেলিম মন্ত্রী হয়ে তারপর কি করল ? পরে সে ...আত্মীয় স্বজনকে যদি বাদ দিত সবাই ওকে সম্মান করতো।

জামাল উদ্দিন : এই উপদেশ- এই পরামর্শ কি স্যার আপনারা দিতে পারেন নি ?

ডাঃ নুরুল ইসলাম : দিলেও শুনবে না।

জামাল উদ্দিন : আপনি শুধু একজন খ্যাতিমান চিকিৎসা বিজ্ঞানী নন, পাশাপাশি আপনি সাংস্কৃতিক জগতেও বিচরণ করেছেন, নাটকে অভিনয় করেছেন, কবিতা লিখেছেন, এ সম্পর্কে- আজ অনেকেই জানেন না, আপনার সেই স্মৃতিকথাগুলো একটু বলুন।

ডা. নুরুল ইসলাম : গ্রামের স্কুল জীবনে আমি প্রথম নাটকে অংশগ্রহণ করি। চাকরি জীবনে ঢাকা মেডিকেল কলেজে বেশ কয়েকটি নাটকে অংশ নিই। বিলাত থেকে এম.আর.সি.পি. পাস করে জাহাজে করে দেশে ফেরার সময় 'যেমন খুশি সাজো' প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করি। এরপর ঢাকা মেডিকেল কলেজে পুনর্মিলনী উৎসবে গাইনোকলজির অধ্যাপক এ.এফ.নুরুল ইসলাম এবং আরো কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীর সাথে কোরাসে (যেখানে অনুশীলনের প্রয়োজন হয় না) অংশগ্রহণ করি। একই সময়ে ডাক্তার বদরুদ্দোজা চৌধুরী (পরবর্তীতে অধ্যাপক ও উপ-প্রধানমন্ত্রী ও প্রাক্তন মহামান্য রাষ্ট্রপতি) রচিত 'ডায়াগনোসিস (রোগনির্ণয়)' নাটকের প্রধান চরিত্রের ভূমিকায় কার্ডিওলজিস্ট হিসেবে অংশ গ্রহণ করি। এরপর আরো বেশ কয়েকটি নাটকে অভিনয় করার সুযোগ হয়। শেষপর্যন্ত কতটুকু কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পেরেছি জানি না, তবে

উৎসাহ ছিল। আমরা কয়েকজন মেজর জেনারেল এম.আর. চৌধুরীর অফিসে বসে একটি বিশেষ তদন্ত কমিটির রিপোর্ট দেখছিলাম। কথায় কথায় জেনারেল চৌধুরী কলকাতা মেডিকেল কলেজের 'যেমন খুশি সাজো' অনুষ্ঠানে আমার প্রথম পুরস্কার প্রাপ্তির কথা মনে করিয়ে দিলেন। তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। মনে পড়ে গেল কীভাবে ভিখিরি সেজে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলাম, নিজের নাম দিয়েছিলাম 'দুখু মিয়া'।

জেনারেল চৌধুরীকে কৃতজ্ঞতা ভরে ধন্যবাদ জানালাম। ঘটনাটা মনেই ছিল না।

জামাল উদ্দিন : আপনার জন্মস্থান চন্দনাইশে, চন্দনাইশে কিছু করেছেন কিংবা করার চিন্তাভাবনা আছে কি ?

ডা. নুরুল ইসলাম : চন্দনাইশে এ পর্যন্ত তেমন কিছু করিনি। তবে জন্মস্থান হিসেবে আমার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। আমি মনে করি জন্মস্থান মাতৃভূমির উপরে। এই সম্পর্ক আবেগের, এখানে কিছু করতে পারলে নিঃসন্দেহে আমি খুশি হবো, এ অঞ্চলের লোকজনকে মনে হয় আমার একই পরিবার। আমাদের গ্রামের বাড়িটি বর্তমানে অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে। এখানে একটা কম্পিউটার সেন্টার কলেজ প্রতিষ্ঠার ইচ্ছে আছে। বর্তমান চাহিদা অনুসারে কম্পিউটারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সেই হিসাবে ইসলামী ব্যাংকের সাহায্যে একটা কম্পিউটার প্রজেক্ট শুরু করেছি। আশাকরি ভবিষ্যতে সেটাকে সম্প্রসারণ করা সম্ভব হবে। হয়তো বা মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন পরম করুণাময়ের ইচ্ছায় বাস্তবে রূপ নেবে।

শরীফা বুলবুল : কিছু মনে করবেন না একটা প্রশ্ন করছি যেহেতু আপনিও একজন ডাক্তার- ডাক্তারদের নিয়ে একটা অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায় তারা সরকারী হাসপাতালে সেবা দানের চেয়ে নিজেদের ক্লিনিক নিয়েই ব্যস্ত থাকেন বেশী-এ ব্যাপারে আপনার প্রতিক্রিয়া জানতে চাচ্ছি ?

ডা. নুরুল ইসলাম : যদি আমার ক্ষমতা থাকতো বোমা মেরে সমস্ত ক্লিনিক ধ্বংস করে দিতাম। যেহেতু ক্লিনিক আছে সেহেতু ডাক্তার আছে-তাতে লোক এবং লোকসানী হিসাব থাকে। আমার ক্ষমতা থাকলে আজকেই বোমা মেরে সব ক্লিনিক ধ্বংস করে দিতাম। ক্লিনিক-পেশাকে ধ্বংস করে, নীতিকে ধ্বংস করে, চিকিৎসাকে ধ্বংস করে। কেন চিকিৎসাকে ধ্বংস করছে-ক্লিনিকে গেলেই স্যালাইন দেবে চমক লাগাবার জন্য-হাতের ম্যাশিন লাগিয়ে দেবে। দশ রকমের পরীক্ষা করবে বিশ রকমের ওষুধ দেবে। এগুলো যে কোনো সভ্য দেশে টিকতে পারে না।

এদিকে সরকারের দৃষ্টি নেই। নীতি নির্ধারণ নেই, প্রশাসনের সীমাবদ্ধতা নেই। বেপরোয়া ক্লিনিক ব্যবস্থা দিন দিন তাই বেড়েই চলেছে। দরিদ্র জনগণ অসহায়। নীতিবিহীন চিকিৎসকদের পোয়াবারো, ঔষধ কোম্পানীরা খুশি। সরল প্রাণ দরিদ্র জনগণ অসহায়। এদের পরিত্রাণ দিতে হবে। বর্তমানে চিকিৎসা পেশার মান সম্মান

ধূলায় লুণ্ঠিত। চিকিৎসা পরম সংকটে। বাচ্চা বেশী থাকলে যেমন অসভ্যতার লক্ষন। ক্লিনিক বেশী থাকলেও চিকিৎসা ক্ষেত্রে অসভ্যতার লক্ষণ।

শরীফা বুলবুল : এর থেকে উত্তরণের পথ কী ? সরকারের এর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া উচিৎ নয় কী ?

ডা. নুরুল ইসলাম : সরকার সৎ নয়। তাই কঠোর পদক্ষেপ নিতে পারে না। সৎ সরকার হলে সৎ কাজ হবে।

শরীফা বুলবুল : প্রত্যেক সরকারের আমলেই তো এই ক্লিনিক গড়ে উঠেছে তবে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন প্রত্যেক সরকারই অসৎ ?

ডা.নুরুল ইসলাম : অসৎ না হলেও সৎ নয়। সৎ হলে সৎ কাজ করতো।

শরীফা বুলবুল : ছাত্ররাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন আপনি ?

ডা. নুরুল ইসলাম : রাজনীতি থাকলে হয়তো বর্তমান নীতিতে আসতে পারতাম না।

শরীফা বুলবুল : জানতে চাচ্ছি আপনি যুক্ত ছিলেন কিনা ?

ডা. নুরুল ইসলাম : সক্রিয়ভাবে না।

জামাল উদ্দিন : বর্তমান ছাত্ররাজনীতিকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ণ করেন ?

ডা. নুরুল ইসলাম : এখন তো ছাত্ররাজনীতিই নাই। রাজনীতিই আছে। বর্তমান ছাত্ররাজনীতি ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই, পলিটিক্যাল পার্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিএনপি বলুন আওয়ামী লীগ বলুন– এদের ছাত্র শাখা আছে, কাজেই এরা শাখা। এটা ওদের নিজেদের নীতি নয়। ওদের দলীয় নীতি। সেখানেই তো ভুল।

জামাল উদ্দিন : কোন ছাত্র সংগঠনের রাজনীতিকে সমর্থন করেন ?

ডা. নুরুল ইসলাম : আমি ছাত্ররাজনীতি সমর্থন করি না। ছাত্রদের নীতি সমর্থন করি। সেটা হলো পড়াশোনার নীতি-এর বেশী নয়।

শরীফা বুলবুল : আপনার কি মনে হয় এদেশে কোনো সৎ রাজনৈতিক দলের আবির্ভাবের সম্ভাবনা আছে ?

ডা.নুরুল ইসলাম : দেশের বর্তমান যা অবস্থা এবং রাজনৈতিক দলের যা কর্মকান্ড তাতে মনে হয় সাধুতা বাদ দিয়ে অসাধুতার আশ্রয়গ্রহণকারীরা রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে টিকে থাকা মন্ত্রীত্ব সদস্যপদ প্রশাসনে বিশেষস্থান সবকিছুই টাকা পয়সা লেনদেনের মাধ্যমে হয়। সততা পণ্যের মতো ক্রয় বিক্রীর বিষয়বস্তু নয়। বর্তমানে এটা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। সত্যের আগমনে মিথ্যার বিলয়। এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য। পবিত্র কোরানে পরিস্কারভাবে লেখা আছে, 'সত্যের আগমনে মিথ্যের বিলুপ্তি হইবে'। বস্তুত বিলুপ্তি মিথ্যার পরিণাম।' বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এ আসা যাওয়ার বিশাল ব্যাপার খুবই কঠিন তবে কবির ভাষায় 'ধন্য আশা কুহুকিনী তোমার মায়ায় মুক্ত মানবের মন যুক্ত ত্রিভুবন"। কোরানের ভাষায় লা তুকলাতু নিন রহমতিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হইও না। আমাদের আশা নিয়ে সেই সুদিনের অপেক্ষায় থাকতে হবে।

জামাল উদ্দিন : ব্যক্তি জিয়া সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ণ কি ?

ডা. নুরুল ইসলাম : জিয়াউর রহমান সাহেব অসম্ভব সাহসী। আর যাই হোক বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে তিনি যুদ্ধ করেছেন। ভালো লোকই ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর চোখে তো তিনি সাহসী এবং উপযুক্ত লোক ছিলেন। সেদিন তো অনেক মেজর লেফটেন্যান্ট ছিলেন তারা তো বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি বেতারে পাঠ করার জন্য এগিয়ে আসেন নি ! জিয়াউর রহমান সাহেব সাহসী ছিলেন বলেই তিনি সেদিন এই সাহসী কাজটি করেছেন।

জামাল উদ্দিন : জিয়াউর রহমান যখন ক্ষমতায় আসলেন, সামরিক প্রধান হলেন, তারপরে বহুদলীয় গণতন্ত্রের কথা বললেন ...

ডা. নুরুল ইসলাম : জিয়া তার জীবদ্দশায় কোনো সময় এরকম নেংটোভাবে বলেন নি যে আমিই দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছি।

জামাল উদ্দিন : স্যার যেটা বলতে চাচ্ছিলাম স্বাধীনতার বিপক্ষের লোকজনকে এনে তাঁর মন্ত্রী সভা গঠন করলেন- এই সময়টা আপনার দৃষ্টিতে কেমন ? যেমন আজকে আমরা যে অনুভব করছি মৌলবাদের উত্থান, স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তির উত্থান, এটাতো ওখান থেকেই হয়েছে অর্থাৎ জিয়ার সময় থেকেই-ঐ সময়টা মূল্যায়ণ করুন।

ডা. নুরুল ইসলাম : বঙ্গবন্ধু আত্মীয় স্বজনকে দিয়ে অনেক কিছু অর্থাৎ নিজের দুর্বলতা দেখিয়েছেন। জিয়াউর রহমান সাহেবও দুর্বলতা কম দেখান নি,
যতসব কর্নেলকে তার মন্ত্রী সভায় নিয়েছেন, সেখানে আমার ডাক্তারও আছেন একজন, নাম বলবো না, যে মেডিকেল এসোসিয়েশন থেকে বহিস্কৃত হয়ে পরদিন বিএনপি-তে জয়েন করে রক্ষা পেয়েছে। যতসব কনডেম পলিটিশিয়ান সবগুলো বিএনপি-তে জয়েন করেছে।

জামাল উদ্দিন : বর্তমান খালেদা জিয়ার সরকার একজন যুদ্ধাপরাধীকে ওআইসি'র মহাসচিব হিসাবে মনোনয়ন দিয়েছেন এই মনোনয়ন কতটুকু যুক্তিযুক্ত মনে করেন ?

ডা. নুরুল ইসলাম : সালাউদ্দীন কাদের চৌধুরী কোনোদিন ওআইসি'র মহাসচিব হতে পারবেন না, এটা আমার ধারনা।

জামাল উদ্দিন : এবার তো আসলে বাংলাদেশ ওআইসি'র পদটি লাভ করার কথা ?

ডা.নুরুল ইসলাম : এদিকে কোনোদিন আসবে বলে আমার মনে হয় না। আরব দেশগুলোর মধ্যে লিমিটেড থাকবে।

জামাল উদ্দিন : এটা নিয়ে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির অর্থাৎ আওয়ামী লীগ তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে।

ডা.নুরুল ইসলাম : আওয়ামী লীগ যে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে এটা আমি দেখেছি।

জামাল উদ্দিন : বিএনপি'র ভিতরে যারা স্বাধীনতার পক্ষের, ঐ গ্রুপটা তো খুব

সিরিয়াস অবস্থানে-যদিও মুখ খুলতে পারছে না, ওরাও খুব ক্ষেপে রয়েছে...

ডা. নুরুল ইসলাম : এটা কোন কাগজে জানি পড়লাম তো। জনকণ্ঠে নাকি ভোরের কাগজে...

জামাল উদ্দিন : ইউএসটিসিতে লেখাপড়ার খরচ তো খুব ব্যয়বহুল, মেধার উপর কি কোনো মূল্যায়ণ -অর্থাৎ পয়সা নাই অথচ মেধাবী- এমন মেধাবী ছাত্রছাত্রীর কল্যাণে কোনো সহায়তা দান– এরকম কোনো সিস্টেম কী আপনি করে রেখে যাবেন ?

ডা. নুরুল ইসলাম : এমন সিস্টেম থাকা উচিৎ- এটা নিয়ে আমি নিজেও ভাবছি। আপাতত কতগুলি স্কলারশিপ ইনট্রোডিউস করবো। সুযোগের অভাবে কত মেধাবী ছাত্রের জীবনের মোড় ফিরে গেছে, কত স্বপ্ন বিফলে গেছে, কত ছেলের জীবনে দুঃখজনক পরিণতি হয়েছে তা আমার জানা আছে। স্যার হাজী আদমজী দাউদের আর্থিক সাহায্য না পেলে আমার জীবন হয়তো ভিন্ন পথে পরিচালিত হতো, এতে জীবনের শুরুতে তাদের সামান্য আর্থিক অনুদান আমার জীবনে অসামান্য অবদান রেখেছে। ব্যয়বহুল চিকিৎসা পেশা শিক্ষা লাভ করে আমার পছন্দসই পথে আমি এগুতে পেরেছি। মেধাবী ছাত্রের প্রতি আমার কর্তব্যবোধ কৃত্রিম নয়- আন্তরিক। নিজের জীবন থেকে নেয়া এই সুবাদে এমন ছাত্র যাতে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ব্যয়বহুল হলেও যাতে পড়তে পারে তার জন্য একটা ওয়েলফেয়ার ফান্ড গঠন করেছি। এর উৎস ভিসি হিসেবে আমার বেতনের টাকা (মাসে ৩০ হাজার টাকা) যা নিজের ধার্যকৃত এবং USTC ক্যাম্পাসে আমার পেশাধারী আয় থেকে (যেখানে প্রতি রোগী থেকে ২০০০ হাজার টাকা করে নেয়া হয় এবং এই টাকা ঐ ফান্ডে জমা হয়। রশিদ দেয়া হয় ওয়েলফেয়ার ফান্ডের নামে। আমি ১ পয়সাও নিই না। এ ফান্ড থেকে কয়েকজন অনাথ শিশুকে আর্থিক সাহায্য দেয়া হয়েছে। কিছু কিছু ছাত্রকে বই কিনে দেওয়া হয়েছে। ভর্তির পর মা ও বাবাকে হারিয়েছে এমন ছাত্রছাত্রীকে বেতন ও বিভিন্ন ফি মওকুফ করে দেয়া হয়েছে। দরিদ্র অসহায়কে চিকিৎসার সুযোগ দেয়া হয়েছে। বিস্তারিত সব হিসাব দিতে না পারলেও এ কল্যাণমুখী ফান্ড ছাত্রকল্যাণেই ব্যবহৃত হয়েছে, নিজের সুখ সাচ্ছন্দ্যের জন্য নয়। এ কারণেই হয়তো আল্লাহ আমার প্রতি মেহেরবান। অনেক ঝড় ঝাপটা কাটিয়ে শিক্ষাঙ্গনে উচ্ছৃংখলতা কাটিয়ে পেশাগত শত্রুদের হিংসা বিদ্বেষকে পরাভূত করে এখনো স্বগর্বে টিকে আছি। ইউনিভার্সিটির গ্রান্ড কমিশনের পরিদর্শন এবং মূল্যায়ণ অনুসারে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আমরা সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী। আমার মাইনাও ওখানে জমা হয়, প্রতিমাসে যাট থেকে আশি হাজার টাকা আমার তরফ থেকে ঐ ফান্ডে জমা হয়। কত জমা আছে আমি জানি না। কিছুদিন আগে পি এইচ পি গ্রুপের সূফী মিজানুর রহমান দশ লাখ টাকা দিয়েছেন। যদি বিশ লাখ তিরিশ টাকা জমা রেখে- মাসে বিশ হাজার তিরিশ হাজার টাকা আয় হয়-তাতে তিন চারটি ছেলেকে

আমরা স্কলারশীপ দিতে পারব।

জামাল উদ্দিন : আপনার ইউএসটিসি এবং পাশাপাশি আমাদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ তুলনামূলকভাবে পড়াশোনার মান কোনটাতে বেশী
সন্তোষ জনক ?

ডা.নুরুল ইসলাম : মানের দিক দিয়ে আমাদেরটার কথা লোকে তো বলে ভালো। নিজের বিচার তো নিজে করা ঠিক না। অন্যরা করবে। চট্টগ্রাম মেডিকেলে একটা ছাত্র ভর্তি হলে ধরে নিতে হবে পাঁচ বছর থেকে সাত বছরের আগে শেষ হবে না। জীবনের দুটো বছর নষ্ট হয়। আমাদের এখানে একটা দিনও নষ্ট হয় না। ঠিক পাঁচ বছরেই কমপ্লিট। পরীক্ষা শেষে ৫-৭ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশিত হয়ে যায়। কোনো সেশন জট নেই। স্ট্রাইক নেই। আগে হতো এখন এগুলো সব বন্ধ হয়ে গেছে। শিক্ষকদের কোনো রাজনীতি নেই। চট্টগ্রামে তো মারামারির অভাব নেই।

জামাল উদ্দিন : চট্টগ্রাম মেডিকেলে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা আছে ইউএসটিসিতে কি সেই সুযোগ সুবিধা আছে ?

ডা. নুরুল ইসলাম : সবকিছু আছে। চট্টগ্রাম মেডিকেলের তুলনায় আমাদের শিক্ষক সংখ্যাও বেশী। চট্টগ্রাম মেডিকেলে পোষ্টিং দিলে ডাক্তাররা সেখানে যায় না, ওরা ঢাকায় চলে যায়।

জামাল উদ্দিন : অনেকেই স্যার ব্যক্তিগত চেম্বার খুলে বসে থাকেন...

ডা. নুরুল ইসলাম : এসব করেই তো ওরা দেশটা ধ্বংস করছে।

শরীফা বুলবুল : আপনার এখানে তো এরকম কোনো সিস্টেম নেই। অর্থাৎ কোনো শিক্ষক অবহেলা কিংবা ফাঁকি ?

ডা.নুরুল ইসলাম : ফাঁকি দেওয়া এটা মজ্জাগত, তবে আমি এসব এ্যালাও করি না। আমি ফোন করে দেখি, কে কোথায় আছে কী নেই। প্রতি মাসে কি পড়া হয়েছে জেনে নিই। কোনো শিক্ষক যদি সেমিনার না করে, পাবলিকেশন না করে, তার প্রমোশন দিই না আমি।

জামাল উদ্দিন : চট্টগ্রাম মেডিকেলে দেখা যায় একটা রোগী ভর্তি হলে-তার এই রিপোর্ট সেই রিপোর্ট ইত্যাদি ইত্যাদি মেডিকেল থেকে করা হয় না, ডাক্তাররা বাইরে রেফার করে দেয়-আপনার এখানে কি রকম নিয়ম এটা জানতে চাচ্ছি ?

ডা.নুরুল ইসলাম : আমার এখানে বলেছি কোনো রোগীর কোনোকিছু যদি বাইরে পরীক্ষা করতে হয় -প্রথমে সেটা প্রফেসারকে সার্টিফাই করতে হবে যে আমাদের এখানে তা হয় না তাহলে করতে পারবে। তারপরও যদি বাইরে করতে বলে তবে সেটার শাস্তি হবে। তারপরও ডাক্তাররা বাইরে পাঠায়-ঐ যে কমিশন পায়।

জামাল উদ্দিন : স্যার ধরুন আপনি ইউএসটিসিতে নাই- আপনার অবর্তমানে ইউএসটিসি কিভাবে চলবে ? এখন তো আপনি আছেন বিশাল একটা পাহাড়ের মতোই

আছেন ইউএসটিসির জন্য-এটা স্যার আমার নয় অনেকেরই কথা। আপনি রাস্তায় একলা হাঁটলে সবাই মনে করে আপনার পেছনে কয়েক কোটি লোক হাঁটছে-অর্থাৎ আপনি একা নন। কিন্তু আপনি যখন থাকবেন না, তখন এটার কি হবে ?

ডা. নুরুল ইসলাম : এটা তো কঠিন প্রশ্ন। সেটা তো আমি প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি। এটাতো খালি থাকবে না কেউ না কেউ চলে আসবে। এখন যেমন আমি আছি বলে ভয়ে ঠিকভাবে চলে- আমি না থাকলে এরকম থাকবে না। প্রথম ভয় ছিল টাকা পয়সা সব ভাগ করে খাবে। সেটা বন্ধ করেছি। যত টাকা ছিল সব টাকা পয়সা দিয়ে আমি হাসপাতালের জন্য জমি জমা কিনে ফেলেছি- ভাগ করে খাওয়ার জন্য টাকা রাখিনি। দ্বিতীয়ত একটা জনসেবা ফাউন্ডেশন করেছি অর্থাৎ জনসেবা ট্রাস্ট। যেখানে কোনো পলিটিক্স নেই। ঐ ট্রাস্টে এমন আইন কানুন আছে যেখানে যে কোনো লোক ইচ্ছা করলে ঢুকতে পারবে না। আমি যতদিন বেঁচে আছি আমিই থাকবো এটার চেয়ারম্যান। আমার অবর্তমানে আমার স্ত্রীই হবে এর চেয়ারম্যান। মূলকথা হলো টাকাগুলো সব ইনভেস্ট করা হচ্ছে। নার্সিং হোস্টেল, তিন নম্বর ব্লক, চার নম্বর ব্লক সবগুলো একসাথেই করছি।

জামাল উদ্দিন : ঢাকা যেহেতু বড় শহর সেখানে আরো বড়ো কিছু করার চিন্তা ভাবনা আছে ?

ডা. নুরুল ইসলাম : চট্টগ্রামে যে সুবিধা পেয়েছি ঢাকায় সেটা পেতাম না। সবচেয়ে বড়ো কথা চট্টগ্রামের মানুষদের কাছ থেকে আমি যতটুকু সহযোগিতা পেয়েছি-সেটা কোথাও পেতাম না। ওরা আমাকে ভীষণভাবে বিশ্বাস করে, ভালোবাসে। এজন্য চট্টগ্রামে অনেককিছু করা সহজ হয়েছে।

শরীফা বুলবুল : পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাসের ভুল ব্যাখ্যা হচ্ছে এটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন ?

ডা. নুরুল ইসলাম : এরা ইতিহাস মুছে ফেলতে পারবে না। শেখ মুজিব জাতির পিতা-জাতির পিতাই থাকবেন। জিয়াউর রহমান সাহেবও উপরে থাকবেন না, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবও নীচে থাকবেন না। সত্যের বিনাশ নাই। এটা একদিন-না একদিন প্রতিষ্ঠিত হবেই।

জামাল উদ্দিন : ঢাকার বুকে এক খন্ড চট্টগ্রাম, যার নাম চট্টগ্রাম সমিতি। আমরা জানি এ সমিতির যাত্রা অভিভক্ত ভারত বর্ষের কলকাতায়। আপনি এই সমিতির সাথে জড়িত থেকে কি পেলেন- এবং কি দিলেন ?

ডা. নুরুল ইসলাম : এই যে সমিতি যার সাথে প্রথম সম্পর্ক গড়ে ওঠে জীবনের সবচেয়ে দুর্যোগময় মুহূর্তে। তখন আমি কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র। আর্থিক সঙ্গতি ছিল না যাতে করে একটা ব্যয়বহুল শিক্ষায় দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে পড়াশোনা করতে পারি। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ এটা সহায়ক হলেও খরচের

তুলনায় তা ছিল যৎসামান্য। আমার একই সময়ে বন্ধু কামাল উদ্দিন আহমেদও একই মেডিকেল কলেজের ছাত্র। তার অবস্থাও তেমন স্বচ্ছল ছিলনা। ঘটনাক্রমে দু'জনই একই বাড়িতে ভিন্ন তলায় নিকট আত্মীয়দের বাসায় থেকে পড়াশোনা করছিলাম। এক পর্যায়ে আমরা জানতে পারলাম কলকাতাস্থ চট্টগ্রাম সমিতির মাধ্যমে মরহুম সোলায়মান চৌধুরী সাহেব চট্টগ্রামবাসী ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার জন্য বৃত্তি হিসেবে এককালীন কিছু অর্থ দান করবেন। দরখাস্ত করলাম আমরা দু'জনই। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল মেধার ভিত্তিতে আমরা দু'জনই আর্থিক সাহায্য পেলাম। এ সামান্য মাসিক ৩০ কি ৪০ টাকা হবে। তখনকার দিনে এ টাকার মূল্য অনেক। স্বীকার করি আমাদের দু'জনেরই কপাল ভাল ছিল। সেদিন এ সাহায্য না পেলে ভাগ্য আমাদের কতটুকু টেনে তুলতে পারত তা ছিল কল্পনার বিষয়। কলকাতাস্থ চট্টগ্রাম সমিতির সেই অনুদান আমাদের জীবনের প্রথম পদক্ষেপে একটা অসমান্য অবদান। পরবর্তীতে আমরা দুজনই নিজ নিজ ক্ষেত্রে দেশে-বিদেশে শিক্ষা লাভ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করি। গর্বের সাথে বলতে পারি আমাদেরই অনেক উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র শুধু দেশেই নয় বিদেশেও ছড়িয়ে আছেন। এ চট্টগ্রাম সমিতি আমার কাছে একটা অনুপ্রেরণা-এর সাথে আমার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। কখনো নিজেকে সমিতির কার্যকলাপ থেকে দূরে রাখতে পারিনি। ১৯৬২ সালের বার্ষিক সাধারণ সভায় সমিতির সভাপতির দায়িত্ব যখন আমার ওপর ন্যস্ত করা হল তখন সমিতির নিজের বলতে কিছুই ছিল না। তবে যেটা ছিল তার কোনো হিসেব করা যায় না। সেটা হল আমার প্রতি সকলের অকৃত্রিম বিশ্বাস, সহযোগীতা ও ভালবাসা। এগুলো সম্ভব করে জন্মভূমি থেকে সুদূর মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত যেখানেই চট্টগ্রামবাসীর কাছে আশা নিয়ে গিয়েছি– কোথাও বিফল হইনি। যেমন, আজকের চট্টগ্রাম ভবন, রামপুরায় নিজস্ব জমি, ব্যাংকের মোটা অংকের ঋণ পরিশোধ এগুলোর পেছনে সমিতির প্রত্যেকটি কর্মীর অকৃত্রিম সহযোগীতা যেমন আমাকে সাহায্য করেছে তেমনি উৎসাহ দিয়েছে দানশীল চট্টগ্রামবাসী। যা আজকে আমাদেরকে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির অধিকারী করেছে। সমিতিও পরবর্তীতে স্বীকৃতি স্বরূপ আমাকে বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত করেছে। স্বর্ণপদক আমার কতটুকু প্রাপ্য ছিল সেটা সমিতিই বিচার করে দেখবে।

পরবর্তীতে আমাকে উপদেষ্টা মন্ডলিতে অন্তর্ভুক্ত এবং ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি মনোনীত করে। এরিমধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে তারপর চট্টগ্রাম সমিতির অগ্রযাত্রা থেমে থাকেনি।

বাবলী ইন্ডাষ্ট্রিজের মালিক মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক চট্টগ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে ঐতিহ্যবাহী 'চট্টগ্রামের মেজবান' দিতে সদা অতি উৎসাহী। অসুখে-বিসুখে তিনি এবং তার পরিবারের সকলে আমার কাছে আসেন। সে সুযোগে একটা মেজবান দিতে অনুরোধ জানালে তিনি সাথে সাথে রাজী হলেন। ৮৯ সালের জুন মাসে সংশোধিত

গঠনতন্ত্রের অনুমোদন এবং সেপ্টেম্বর মাসে বার্ষিক সাধারণ সভা এবং নির্বাচনের সিদ্ধান্ত হয়। সেই সময় থেকেই প্রথম মেজবানের আয়োজন শুরু হল। মেজবানের আয়োজন করেও সেদিন ঢাকার বাইরে থাকায় তাতে আমি যোগদান করতে না পারলেও খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম সম্মেলনের ফলাফলে। জেনারেল (অব) করিম, ইঞ্জিনিয়ার আফসার উদ্দিন, ড. নুরুল হক, সাবেক উপ প্রধানমন্ত্রী জামাল উদ্দিন, এম.আর সিদ্দিকী সহ আরো অনেকের প্রচেষ্টায় বিরোধের অবসান তথা সমিতির অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে। নির্বাচনে সাবেক উপ-প্রধান মন্ত্রী জামাল উদ্দিন আহমেদ ও রেজাউল হক মোশতাক সভাপতি ও মহাসচিবের দায়িত্ব নিলেন, আমি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান থেকে গেলাম।

১৯১২ সালে কলকাতায় যে সমিতির জন্ম, যুগ যুগ ধরে নানা উত্থান পতনের মধ্যে এতদিন সমিতি টিকে থাকা অত্যন্ত আনন্দের ও গৌরবের। আশাকরি আগামী দিনগুলো হবে আরো সুখের।

জামাল উদ্দিন : আপনি একজন খ্যাতিমান চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিসেবে দেশ বিদেশে বহুল পরিচিত। সেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে পিজি হাসপাতাল, যক্ষ্মা হাসপাতাল, ইউএসটিসি'র মত বিশাল এক চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা আপনি, শুধু তাই নয়, মাদকদ্রব্য নিবারণ আন্দোলনের সংগঠন আধূনিক, যক্ষ্মা মুক্ত আন্দোলনের সংগঠন জাতীয় যক্ষ্মা সমিতি, এবং জাতীয় ওষুধ নীতির মতো দুঃসাহসিক কার্যক্রমের স্বপ্নদ্রষ্টাও আপনি,- এছাড়া আরো অনেক সংগঠন ও কার্যক্রমের আপনি অন্যতম একজন। জাতিকে আপনি এত কিছু দিলেন, কিন্তু তার বিনিময়ে সরকারী -বেসরকারী কিংবা আন্তর্জাতিকভাবে আপনার কোন মূল্যায়ণ ?

ডা. নুরুল ইসলাম : যে সমস্ত কাজ আমি করেছি কিংবা করার সুযোগ আমার হয়েছে- এসব কাজ তার আগে কেউ করেন নি বলে আমার জন্যই বাকী ছিল হয়তো। দ্বিতীয়ত এ এসব কাজের ফলে আমি দেশে- বিদেশের স্বীকৃতি পেয়েছি। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো যতটুকু পাওয়ার ছিল তার থেকে বেশীই পেয়েছি। যেমন বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা থেকে আধূনিক এর কর্মকান্ডের জন্য পর পর দু'বার বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার স্বীকৃতি পাওয়া একটা ব্যতিক্রম ব্যাপার। ১৯৯০ এবং ১৯৯২ এ দু'সালে আমি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার স্বীকৃতি স্বরূপ সার্টিফিকেট পেয়েছি। পর পর দু'বার এ ধরনের সার্টিফিকেট এ অঞ্চলের আর কেউ পেয়েছে বলে আমার জানা নেই।

এই পাওনা আমার জন্য বিরাট গর্বের। এটা পাওয়ার পর ঠিক সেই সময়ে এরশাদ সাহেব ক্ষমতায় আসেন। তিনি ব্যক্তিগত ভাবেই অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন এই প্রাপ্তির জন্য। এটা আমার জন্য সুখের এবং গৌরবের। যক্ষ্মা সমিতি আমি করতে পেরেছি, ধূমপানের বিরুদ্ধে 'আধূনিক' নামের প্রতিষ্ঠান আমি করতে পেরেছি। যেখানেই খালি ছিল সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করার সুযোগ আমার হয়েছে সেজন্য আমি বলি আমার

নিজের কর্মের চেয়ে আমার ভাগ্যে বেশী শক্তিশালী।

এছাড়াও ১৯৯৭ সালে স্বাধীনতার দিবস পুরস্কার,

চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য 'ওপেন ইউনিভার্সিটি ফর কমপ্লিমেন্টারী মেডিসিন' শ্রীলংকা ২০০০ সালের জানুয়ারি মাসে বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ খেতাব সম্মানসূচক ডি.এস সি ডিগ্রী লাভ। মালয়েশিয়ার এনসটেড বিশ্ববিদ্যালয়ের Dsc. ২০০১ আরেকটি বিরল সম্মান।

বাংলাদেশে চিকিৎসা ক্ষেত্রে পোষ্ট গ্রেজুয়েশন ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তনে অনন্য সাধারণ অবদান রাখার জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিসেবে ১৯৯৫ সালে ইবনে সিনা পদক লাভ।

জামাল উদ্দিন : ১৯২৮ সালে ১ এপ্রিল আপনার জন্ম। আজ ২০০৩, ১১ জুলাই। আজকের দিন পর্যন্ত আপনার বয়স ৭৫ বছর ৩ মাস ১০ দিন। জীবনের এই দীর্ঘ কর্মজীবনে আপনি কি হারালেন এবং কি পেলেন সংক্ষেপে বলবেন কি ?

ডা. নুরুল ইসলাম : যেগুলো হারাবার সেগুলো হারিয়েছি। যেগুলো পাওয়ার সব পেয়েছি কিনা তবে জানি না। কিন্তু যেগুলো হারাবার সেগুলো হারিয়েছি-যেমন আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব মা বাবা। সেই একই নিয়মে হারিয়েছি, কিন্তু তাদের যে আশির্বাদ আর তাদের যে দোয়া কিন্তু সবচে বেশী শক্তিশালী। সেটা আমি মনে করি আমার যা পাওয়ার তারচে অনেক বেশী পেয়েছি। অনেকেই বলে থাকে। অনেক পেয়েছি। অনেক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি আমাকে বলেছেন। আপনার মায়ের দোয়াতেই আপনি আজ এখানে এসেছেন। এটা আমি দৃঢ়ভাবে আন্তরিকভাবে এটা এমন দৃঢ় বিশ্বাস কেউ আমাকে নড়াতে পারবে না। প্রতিটি বিপদে মায়ের নাম যেখানে করেছি সেখানে আমার সফলতা এসেছে। প্রতিটি কাজে প্রতিটি বিপদে আমি উৎড়ে উঠতে পেরেছি। এটা আমার জীবনের বিশাল অভিজ্ঞতা।

শরীফা বুলবুল : সত্যি বলতে কী আপনাকে আমার কেন জানি মা পাগল বা মা ভক্ত ছেলে মনেহয়– জানি ছেলেবেলায় বাবাকে হারিয়েছেন কিন্তু বাবার কোনো ছায়া পড়েনি আপনার জীবনে ?

ডা. নুরুল ইসলাম : বাবার ছায়া পড়া স্বাভাবিক, তবে মায়ের ছায়া বেশী বিশাল ছিল- সে তুলনায় বাবা আমার কাছে হয়ত বলিষ্ঠ ছায়াই হবে যা ধরা পড়েনি। মায়ের হাতেই আমি গড়া। সারাজীবন মায়ের সাথেই কাটিয়েছি। সেই হিসাবে মায়ের প্রভাব আমার উপর বাবার চেয়ে অনেক বেশী হয়েছে- সেটা আমি স্বীকার করি। আমার প্রত্যক্ষ জীবনে মায়ের দোয়া থেকে আমি যে উপকার পেয়েছি এটা কোন প্রমাণের দরকার হয় না, আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সেটা প্রমাণিত হয়েছে। আমার অসুখে, বিপদে, চাকরীর অবসানে সবকিছুতে, যত বিপদ জীবনে এসেছে, মার কাছে গিয়েছি দোয়া পেয়েছি, দোয়ার পরে সার্থকতা এসেছে। এটা আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

শরীফা বুলবুল : জীবনস্রোতে অনেকটা আত্মজৈবনিক একটি বই, জানতে চাচ্ছি এ

বইয়ে সন্নিবেশিত লেখাগুলো প্রতিদিনের ডায়েরীভূক্ত লেখা ? কোন সময়টাতে আপনি লেখালেখির মতো এই পরিশ্রমটা করলেন ?

ডা. নুরুল ইসলাম : দৈনন্দিন ডায়েরী বলতে তেমন কিছু লেখার অভ্যাস ছিল না এবং তা করিনি। তবে জীবনের যে সমস্ত ঘটনা মানুষের মনে এর একটা দাগ কাটে, আমার জীবনের সে সমস্ত ঘটনা, যে সমস্ত ঘটনা ভুলবার নয়। সে সমস্ত ঘটনা আমিও স্বভাবত ভুলিনি। এগুলো মনে আছে, মনে থাকবার মতো ঘটনা। সেগুলো আমি লিপিবদ্ধ করেছি, ভাষা আমার নিজের এবং দ্বিতীয়ত আমি কোথাও গেলে সেখানে কোনো সময় পেলে এসবই লিখি, কাউকে ডিকটেশন দিয়ে লিখে রাখি। আমি অযথা সময় নষ্ট করি না। বিক্ষিপ্ত কিছু কাগজপত্র আছে। তারিখ সন নিয়ে হয়তো ডায়েরী থেকে দেখতে হয়েছে।

কিন্তু লেখাটা আমার সম্পূর্ণ নিজের এবং নিজের স্মৃতি থেকে। হয়তো মাঝে মাঝে কিছু কিছু বাদ পড়ে যেতে পারে। যা লেখা হয়েছে সেগুলো আমার বিবেচনায় সঠিক এবং আমার স্মৃতি থেকে লেখা।

জামাল উদ্দিন : আপনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের বেশ কিছু বই লিখেছেন প্রবন্ধ লিখেছেন, বঙ্গবন্ধুর উপর লিখেছেন এই সময়গুলো আপনি কিভাবে পেলেন?

ডা. নুরুল ইসলাম : এই সময়গুলো যে ভাবে পাই তা হচ্ছে আমি সপ্তায় দু'দিন রোগী দেখিনা- এভাবেই কাটাই, বাইরে ঘোরাঘুরি করি না লেখালেখিই করি। কোথাও বেড়াতে গেলে পাঁচ-ছয় ঘন্টা গাড়ীতে বসে থাকলে তখন সাথে একজন লোক নিই তাকে আমি ডিক্টেশন দিই। তার সময়টাও কেটে যায় আমার কাজটাও হয়। এই কয়েকদিন আগে রাজশাহীতে গেলাম, সেখানে দু'টো অনুষ্ঠানে আমি যোগদান করেছি, আসার পথে একটা অনুষ্ঠানের বর্ণনা আমি কমপ্লিট করেছি। অন্যটার বর্ণনা বাকী অন্যকোন দিনে শেষ করবো।

বঙ্গবন্ধুর সাথে বিদেশে বেড়াতে গেলে অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর সাথে যাওয়া মানে অনেক সুযোগ সুবিধা, অনেক রিক্রিয়েশন, অনেক ফাংশান- ওগুলোতে সবাই ঘুরত, বেড়াতে যেত, অনেক রাতে আসত, ক্লাবে ঐ সময়টাতে না গিয়ে- আমি আমার রুমে বসে লেখাপড়া করতাম। এভাবে করেছি, আমি সময় পেলেই লেখাপড়া নিয়ে সেসব সময় কাটাই। কারণ আমি জানি আমার নিজের লেখা যদি নিজে লিখে যাই- ভবিষ্যতে তা কেউ বিকৃত করতে পারবে না। পিজিতে আমি চাকরী করেছি। আমার শত্রুই হোক না কেন আমার যে লেখা পিজির ইতিহাস সেটাকে কেউ বিকৃত করতে পারবে না। দেশ বিদেশে সব জায়গায় আমি পাঠিয়েছি সেটা। আমি মনেকরি লেখা দলিল হয়ে গেলে কেউ বিকৃত করতে পারবে না। বঙ্গবন্ধু যদি জীবিত অবস্থায় দলিল রেখে যেতেন তাঁকে নিয়ে এতো নানা ধরনের সমস্যা। তর্ক বিতর্ক উঠত না। সেটা তিনি চিন্তা করেননি। আমি মনেকরি বঙ্গবন্ধু জীবদ্দশা এবং পরবর্তী ঘটনাতে এই শিক্ষা এবং অনুপ্রেরণা

পেয়েছি যে আমি নিজেই ইউএসটিসি'র ইতিহাস, পিজির ইতিহাস, চট্টগ্রাম সমিতির ইতিহাস লিখেছি, সব ইতিহাস আমি লিখে রাখব। এছাড়া আমি যেসব বই লিখেছি ঃ মেডিকেল ডায়াগনসিস এন্ড ট্রিটমেন্ট, হিস্ট্রি অব আইপিজিএমআর, প্রেসক্রিপশন, পল্লী চিকিৎসায় অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ, জীবনস্রোতে, তামাক ও ধূমপান ঃ অভিমত-প্রশ্ন-উত্তর, বঙ্গবন্ধু ঃ ব্যক্তিগত চিকিৎসকের দৃষ্টিতে, বঙ্গবন্ধু ঃ ইন দি আই অব হিজ পারসোনাল ফিজিসিয়ান, কিছু ভাবনা, সাম থট্স, আই এ. এইচ এস থেকে ইউ.এস.টি.সি, IAHS To USTC, ধুমপান হারাম কেন Why smoking is huram,Medical diagnosis & treatment.

জামাল উদ্দিন : আপনার জীবনস্রোতে বইটিতে ইউএসটিসি সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে আপনি এমন কিছু লোকের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছেন, সমাজে এদের অবস্থান তো খুব কাহিল হয়ে গেছে- এরা সমাজে পরিচিত ব্যক্তি...

ডা. নুরুল ইসলাম : পিজিতে নিযুক্তি এবং সবাক বিবেক এ-জাতীয় অধ্যাপকের কক্ষ তচনছ যেটা করেছিল সেটা সম্বন্ধে লিখেছি। আর পিজিতে নিযুক্তি-এটা পরোক্ষভাবে লিখেছি, যাদেরকে বিক্ষিপ্ত জায়গা থেকে এনে পিজিতে চাকুরী দিয়েছি, যাদের আমি প্রতিষ্ঠিত করেছি। তারা আমার ক্ষতি করেছে সবচে বেশী। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, একদল লোক এসে বলল, আপনার বদনাম করছে। একটু খানি ভেবে চিন্তে বিদ্যাসাগর বললেন, আমার তো মনে পড়ে না তার আমি কোনো উপকার করেছি। উপকার করলে তার ক্ষতি করাটা মানুষের স্বভাব। সেই জন্য আমি যে উপকার করেছি সেটাই আমি লিখেছি। তারা যে ক্ষতি করেছে সেটা আমি লিখিনি। আমি প্রমাণ করেছি যারা আমার শত্রুতা করেছে তারাই আমার কাছ থেকে সবচে বেশী উপকার পেয়েছে। পিজির নিযুক্তিতে যাদের সাহায্য করেছিলাম তারা সেটার সদ্বব্যবহার না করে শত্রু সেজেছিল, সেটার জন্য আমি দুঃখ করি না, তাদের জন্য আমার দয়া হয়। তারা যেন সৎ পথে চলে আসে।

জামাল উদ্দিন : যেমন জীবনস্রোতে বইটাতে ডা. রবিউল হোসেন, ডা. নুরুন্নবী, ডা. সৈয়দা নুর জাহান ভূঁইয়া, ডা. মাহফুজ, তাদের মুখোশটা আপনি উন্মোচন করে দিয়েছেন– বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর তারা কি তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন নি ?

ডা. নুরুল ইসলাম : আমার একজন সহকর্মীর সাথে পিজিতে একটা অনুষ্ঠানে দেখা হয়েছে সে বলল, স্যার আপনার বইটা নিয়ে পিজিতে খুব আলাপ আলোচনা হচ্ছে, আমি বললাম, আলাপ আলোচনা করছে ঠিক আছে, কিন্তু কেউ কোনো একটা মিথ্যা কথা গোপন করতে পেরেছে ? বলল সে, তা পারেনি। সেটা ঠিক। আমি বললাম, সেটাই আমার জন্য যথেষ্ট। ওরা যদি মনে করে যে আমি সত্য কথা লিখে গেছি সেটাই আমার পুরস্কার।

জামাল উদ্দিন : ইউএসটিসি কানেকশানে যাদের নাম চিহ্নিত করলেন ওরা কোনো

প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে নি ?

ডা. নুরুল ইসলাম : প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে হয়তো ওরা লজ্জা পায়। হয়তো ওরা প্রয়োজন মনে করে না। আমি তো আমার প্রয়োজন শেষ করেছি লিখে। করা উচিৎ, আজ না হলে পঁচিশ বছর পর যখন এই প্রতিষ্ঠানের সিলভার জুবিলি হলে আমি থাকবো না যখন- তখন মানুষ তো মূল্যায়ণ করবে।

আমাদের দেশের মানুষের মৃত্যুর পরে মূল্যায়ণ হয়। জীবিত অবস্থায় খুব কমই হয়ে থাকে। সেসব আমার মৃত্যুর পরে খুব আলোচিত হবে। তখন হয়ত সত্য মিথ্যা বিচার হবে। সত্য টিকে থাকবে-না হয় টিকে থাকবে না। কিন্তু আমি আমার কর্তব্য করে যাচ্ছি। যেটা লেখা আমার দায়িত্ব সেটা আমি করে যাচ্ছি।

শরীফা বুলবুল : আপনার দেখা ৫০ বছর আগের চট্টগ্রাম নগরীর স্মৃতিচারণ করুন।

ডা. নুরুল ইসলাম : জীবনের সবচেয়ে স্মৃতিময় ঘটনা ঘটেছে চট্টগ্রাম শহরে। ম্যাট্রিক পাশ করার আগে চট্টগ্রাম শহর দেখিনি। এখানেই প্রথম আসি। আসার পর যা ঘটেছে তা-তো আগেই বলেছি। তখনকার চট্টগ্রাম আর বর্তমান চট্টগ্রামের সাথে তো কোনো মিল নেই। তখন যদি কেউ চট্টগ্রাম শহর দেখে যেত এবং পৃথিবীর অন্যপ্রান্তে বা অন্য দুনিয়ায় চলে যেত এবং বর্তমানে যদি সে এসে দেখতো তাহলে সে চট্টগ্রামকে চিনতে পারতো না। এতো পরিবর্তন হয়ে গেছে। যেখানে কিছুই ছিল না সেখানে বিরাট অট্টালিকা, যেখানে রাস্তা ছিলনা সেখানে বিরাট ঘর, সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেছে। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও চট্টগ্রামে অনেক ব্যবসায়ীর বিলুপ্তি ঘটেছে। নতুন নতুন ব্যবসায়ী এসে গেছে। তবে চট্টগ্রামের অনেক কিছু বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সেটা সব জায়গায় হয়েছে। চট্টগ্রামেও তার ব্যতিক্রম নয়।

আমি তো চট্টগ্রামের বাইরে বাইরে কাটিয়েছি। তবে মাঝে মাঝে আমি গ্রামে আসতাম। আগে তো আমার গ্রাম থেকে চট্টগ্রাম শহরে আসতে একদিন লাগত। নৌকা করে আসতে হতো, গাড়ী ঘোড়া ছিল না কিছুই। আরাকান রোড বলে আজ যেটা পরিচিত অর্থাৎ যেটা এখন কক্সবাজার রোড। সেই রাস্তা দিয়ে সারা বছরে একটা কি দুটো গাড়ী চলতো কী না সন্দেহ। এখন তো প্রতিদিনই কয়েক হাজার গাড়ী চলে, চট্টগ্রামে রিকশা ছিল কয়েকটা, গাড়ী ছিল খুবই কম। এখন তো গাড়ীর কোনো সীমা নাই। প্রতিটি ক্ষেত্রে-হাসপাতাল বলুন, আবাসিক এলাকা বলুন, পথ ঘাট বলুন, সুযোগ সুবিধা, দোকানপাট সবদিক দিয়ে পরিবর্তন। পুরনোর অস্তিত্বের সেই চট্টগ্রাম অনেকদূর এগিয়ে গেছে।

তবে যতটুকু এগুনোর উচিৎ ছিল ততটুকু এগোয়নি এটাও স্বীকার করতে হবে।

শরীফা বুলবুল : ইউএসটিসি'র মতো বিরাট স্বপ্নের প্রণোদনা আপনি কিভাবে পেলেন ?

ডা. নুরুল ইসলাম : বলা মুশকিল, মনে হয় এটা আল্লাহর ইচ্ছা ছিল।

শরীফা বুলবুল : তবু এই বিরাট স্বপ্নের প্রেক্ষাপট আমাদের জানাবেন ?

ডা.নুরুল ইসলাম : প্রথমত আমি ইমাম ট্রেনিং সেন্টার থেকে আরম্ভ করি। রেলের সরকারী জায়গাতে ইসলামী মেডিক্যাল মিশন নামে আমার একটি প্রতিষ্ঠান ছিল, ইমামদের ওখানে ট্রেনিং দিতাম। ট্রেনিং দেয়ার পর সৌদি অ্যাম্বেসেডার আবদুল্লাহ আল মাইমানিকে সেখানে সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে এনেছিলাম। ঐ অনুষ্ঠানে এক ভদ্রলোক এসে বললেন যে আপনাকে আমি দশলাখ টাকা দিতে চাই। আমি চাইনি, কোনোদিন বলিও নি। দশলাখ টাকা পাওয়ার পরেই তখন প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ আমরা হয়তো শুরু করবো ... দশলাখ টাকা তিনি সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন, এবং আমাকে দিয়ে বলেছিলেন কাগজ দিতে পারবেন না- কোনো রিসিট দিতে পারবেন না। তারপরে প্রেস কনফারেন্স হয়েছিল আমি কিচ্ছু বলিনি।
ঐ টাকাগুলো পাওয়াতে আমরা মেডিকেল কলেজ ষ্টার্ট করতে পেরেছি। অতিমাত্রাও হয়তো বলতে পারেন, অতি সাহস না থাকলে হয়তো আজ এতোদূর আসতে পারতাম না। সেই দশলাখ দিয়ে একটা টিনশেড-এ মেডিকেল কলেজ শুরু করে দিলাম ৪৩ জন ছাত্র নিয়ে। ১৯৮৯ সালের ১৩ মে। এই যে করলাম, প্রথমবার মনে করেছি কিছু বুঝিনি। ধীরে ধীরে আজ এ পর্যায়ে এসেছি। বলতে গেলে প্রথমত আমার ইচ্ছে। হয়ত মনে সুপ্ত ইচ্ছে ছিল- কিন্তু সেটা প্রকাশ পেল এই টাকা পাওয়ার পরে। কাজেই চিন্তা যদি আমার হয়ে থাকে- যিনি দশলাখ টাকা দিয়ে এগিয়ে এসেছেন তার কৃতিত্ব কম নয়। তিনি হলেন টি কে অয়েল মিলস এর কালাম সাহেব। তাঁর কথা আমি সবসময় প্রায় জায়গায় বলে থাকি। এমন সময়ে দশলাখ টাকা নিয়ে আসা ! এটা সৎ সাহসের পরিচয়। যেমন দশএকর জমি পেয়েছি কক্সবাজারে। আমি চাইনি তাও পেয়ে গেছি এ সবই মানুষের অফুরন্ত দোয়া এবং সর্বোপরি পরম করুণাময়ের রহমত এবং আমার স্নেহময়ী মায়ের দোয়া।
জামাল উদ্দিন : হয়তো স্যার আপনার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন বলেই তাঁরা এগিয়ে এসেছেন...
ডা.নুরুল ইসলাম : আমি হয়তো সৌদি অ্যাম্বেসেডরকে বলেছিলাম, কারো সাহায্য পেলে এটাকে আমরা আরো সম্প্রসারিত করতে পারবো, জনগণের কল্যাণে কিছু করতে পারবো। চিকিৎসায় জনশক্তি তৈরি করার নিশ্চয়ই আমার সুপ্ত মনে ইচ্ছে ছিল যে আমি ডাক্তার তৈরী করবো। সেটা ১৯৫৯ সালের কথা।
শরীফা বুলবুল : আপনি কি আপনার ছাত্রদের কোনো বিশেষ চেতনায় দীক্ষিত করতে চাইতেন কিংবা চান ?
ডা. নুরুল ইসলাম : আমি প্রায়ই বলে থাকি সততা মানুষের বিপর্যয় করতে পারে না বন্ধুর সময়ে। এবং প্রতিটি সৎ কাজে শত্রুতা থাকে। শত্রুতা সতর্কতা আনে। সতর্কতা সফলতা আনে। আমার সাথে যারা শত্রুতা করেছে, তারা আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছে, সাহসী করে তুলেছে এবং এগিয়ে যাওয়ার প্রয়াস যুগিয়েছে। সেজন্য আমি

তাদের অভিনন্দন জানাই। আমি মনেকরি আমি তাদের কাছে ঋণী।

শরীফা বুলবুল : নিজের সম্পর্কে মূল্যায়ণ করুন– আপনি কি মেজাজী মানুষ না শান্ত ? ভীরু না সাহসী ?

ডা. নুরুল ইসলাম : ভীরু তো আমি একেবারেই না। সেটা আমি অস্বীকার করবো না। আমার মা যেমন সাহসী আমিও তেমনি সাহসী। ভয় আমি কোনোদিনও করিনি। চাকরী জীবনে হোক আর যেখানেই হোক। আমি মেজাজী এবং শান্ত দুটোই। প্রয়োজনে আমি হঠাৎ রেগে যাই। আমার সাথে ডা. ইব্রাহীম সাহেবের সাথে তুলনা করলে অনেক মিল খুজে পাওয়া যায়। বস্তুত তিনি ছিলেন আমার আদর্শ। ঠিক ঠিক সময়ে তিনি অফিসে এসেছেন, আমিও আসি। ঠিক সময়ে সব কাজ তিনি করতেন, আমিও করি। সারাদিন ধরে তিনি কাজ করতেন, আমিও করি। তফাৎ ছিল তিনি শত্রুদের সাথে মিশতে পারতেন। আমি শত্রুদের সাথে আন্তরিকভাবে মিশে কৃত্রিম হাসি দেখাতে পারি না।

শরীফা বুলবুল : নিজেকে আপনি সফল না ব্যর্থ মানুষ মনে করেন ?

ডা. নুরুল ইসলাম : ব্যর্থ মানুষ বললে হয়তো এটা পাপ হবে। আমি মনে করি যে আমি যা চেয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশী পেয়েছি।

শরীফা বুলবুল : বার্ধক্য আপনার কেমন লাগছে ? যৌবনে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে ?

ডা. নুরুল ইসলাম : আমার জন্মদিন পালন করার সময় আমার নাতী নাতনীরা অনেকে ছিল। কক্সবাজার সেন্টমার্টিন আইল্যান্ডে যাওয়ার সময় হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে তারা বলল যে আপনার আজকে শুভ জন্মদিন। কেক কাটা, অনেক গান বাজনা করে সারা রাত্রি কেটেছে। আমাকে যখন গান করতে বলল, আমি কবিতা শোনালাম- সেটা তাৎক্ষণিকভাবে আমি লিখে ফেলেছিলাম, সেটা পড়ে শুনিয়েছিল আমার আদরের সুন্দরী নাতনী রেজোয়ানা কালাম লিজা।

"আজকে আমার জন্মদিনে
তোমাদের গানে গানে
আসা জাগে আমার প্রাণে
ইচ্ছে হয় আমি যেন ফিরে
যাই আমার যৌবনে।"

জামাল উদ্দিন : আপনার বৈবাহিক জীবন সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জেনেছি কিন্তু আপনার স্ত্রীর পিতৃপরিচয় এবং তাঁর কর্ম জীবন সম্পর্কে তেমন জানা যায় নি, জানতে চাচ্ছি ...

ডা. নুরুল ইসলাম : আমার শ্বশুর এডভোকেট আলী আহমদ সাহেব। রিয়াজউদ্দীন বাজারের চৈতন্যগলিতে তাদের নিজেদের বাড়ী-ঐ যে মুরগীর হাট-টা আরকি। সারাজীবন ধরে আমার শ্বশুর ধুতি পড়তেন, ধূমপান করতেন, আমার সাথে সম্পর্ক হওয়ার পরে আমি হয়তো অতো প্রভাবশালী হতে পারিনি- কারণ আমি জানলে তো

ধূমপান বন্ধ করাতাম।

আমার স্ত্রী শিক্ষক ছিলেন। সে লন্ডন থেকে এডুকেশনে ডিপ্লোমা করেছে। করার পরে টিচার্স ট্রেনিং কলেজে শিক্ষক হিসেবে ছিল। বিয়ের পর ও চাকরী ছেড়ে দিল, আমার শ্বশুর মনে করতেন আমি তার চাকরী ছাড়িয়েছি, আমি তা করিনি।

ওর ধারনা বিয়ের পরে যদি চাকরী করে ছেলেপেলে মানুষ হবে না। ও মনে করে ওর ছেলেমেয়েকে দেখবার জন্য আমার লোকজন নেই। আমার মা-ও ছিলেন, তবুও। একেকজনের একেকটা ইগো থাকে। এটা তারও একধরনের ইগো। সে চাকরীটা ছেড়ে দিল। আমার শ্বশুর মনে করতেন, আমি ওকে চাকরী ছাড়িয়েছি, এটা ঠিক নয়, আমি বলিনি তাকে চাকরী ছাড়তে। অনেকে শিক্ষকতা পছন্দ করে অনেকে করে না। আমার বিয়ে হয়েছে ১৯৬২ সালে, আমাদের প্রথম সন্তান হয় ১৯৬৪ সালে। এরপর আমার স্ত্রী শিক্ষকতা ছেড়ে মাতৃত্বকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। তার ধারনা সে সামনে না থাকলে বোধহয় তার ছেলেমেয়েরা অবহেলিত হবে।

শরীফা বুলবুল : আপনার কি মনে হয় শেখ হাসিনা সরকার আপনাকে অবহেলা করেছে ? অথচ ইতিহাস বলে অন্য কথা অর্থাৎ হাসিনা সরকারের কাছ থেকে আপনার বেশী সম্মানই পাওয়ার কথা- এই অবহেলা কেন ?

ডা. নুরুল ইসলাম : এক কথায় বলতে গেলে এটা হাসিনার ভুল। বঙ্গবন্ধু হলে যে ভুলটা করতেন না। এরা ভুল করেছে যে সময় যেভাবে সুযোগ এসেছে তা সদ্ব্যবহার করেনি এটার প্রমাণ তো বঙ্গবন্ধু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা। সেটা যে করেনি সেটা সুযোগের অবহেলা করেছে।

বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি রক্ষার জন্য এটা নিশ্চয়ই একটা অন্যতম উৎকৃষ্ট অবদান, এ অবদানের পেছনে যদি তার কোনরকম সহায়তা লিপিবদ্ধ না থাকে এটা তাঁর জন্য দুঃখের এবং আমার জন্যও গৌরবের নয়।

শরীফা বুলবুল : একাত্তরের রক্তকান্ডকে আপনি কোন দৃষ্টিতে দেখেন ?

ডা. নুরুল ইসলাম : সকলের একই দৃষ্টি। পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ টিকে থাকবে না এটা আমি অনেক আগেই বলেছি। আমি যখন ১৯৬২ সালে লন্ডনে যাই নাফিল্ড ফেলোশিপ করতে। তখন নাফিল্ড এর যে কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার হাক্সলিকে আমি বলেছিলাম, আমাদের একটা ঝগড়া হয়েছিল স্বাধীনতা দিবস সম্বন্ধে। আমি বলেছিলাম যে প্রত্যেক দেশে স্বাধীনতা দিবসে-একটা অনুষ্ঠান হয়- যে যে দেশের স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়- সে সে দেশের বিশিষ্ট খাবার নিয়ে আসে।

নাফিল্ড ফেলোশিপের এক পাকিস্তানি ছাত্র বলল, আমাদের স্বাধীনতা দিবসে মদ দেয়ার জন্য। আমি বললাম, মদ দেব না-চা দেব। ওর সাথে আমার খুব ঝগড়া হল। হাতাহাতি হওয়ার উপক্রম। তখন ড. রাজা মোহাম্মদ নামে একলোক ছিল খুব ধার্মিক। অসম্ভব ভালো লোক। সে আমাদের ঝগড়া মিটিয়ে দিল। পরের দিন ঘটনাটা

ব্রিগেডিয়ার হাক্সলির কানে যায়, তিনি বললেন তোমাদের নাকি একটা ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে ? আমি বললাম, হ্যাঁ, তিনি বললেন, তাহলে তুমি কি মনে কর তোমাদের পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে গোলমাল হবে ? বললাম হ্যাঁ, পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে গোলমাল হবে। দু'টো দেশ এক সাথে টিকতে পারবে না। সেটা আমি ১৯৬২ সালে বলেছি। এরপর বঙ্গবন্ধু অনেকবারই বলেছেন, যা হোক এদেশ বিভাগ হওয়া অপরিহার্য ছিল। তার পরিণতি হয়েছে অবশ্য সুখের এবং দুঃখের। এই দুয়ের সংমিশ্রণ। আমরা অনেকদিক দিয়ে লাভবান হয়েছি, অনেক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্থও হয়েছি, স্বাধীন হয়েছি, লাভবান হয়েছি, সেটা ঠিক নয়। সেটা রাজনীতিবিদদের দোষে অথবা আমাদের ভাগ্যের দোষে যা-ই হোক। তবে রাজনীতিবিদদেরই দোষেই বলে আমি মনে করি। যা-ই হোক যেভাবে চলছিল সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য।

আমিই প্রথম নাফিল্ড ফেলোশিপ পাই আমার আগে কোনো চিকিৎসক নাফিল্ড স্কলারশীপ পায়নি। আমিই প্রথমবার পাই খুদরত ই খোদা বেঁচে ছিলেন বলেই, প্রথমবার আমাকে নাফিল্ড ফেলোশিপ দিল না যদিও আমি সবচে বেষ্ট ক্যান্ডিডেট, জানতে চাইলাম কেন ? বলে তিনি হোমিওপ্যাথিকে সাপোর্ট করেছেন, একজন মডার্ণ মেডিসিনের ডাক্তার হয়ে তিনি হোমিওপ্যাথি সাপোর্ট করলেন ! আমাকে বললেন, তোমার মতো হোমিওপ্যাথির জন্যেও মানুষের মনে যথেষ্ট জায়গা আছে।
এটা শত্রুতা করে আমাকে প্রথমবার দেয় নি। সেটা সেবার এক পাকিস্তানীকে দিয়েছিল। পরের বার খুদরত-ই-খোদা ঐ কমিটিতে ছিলেন তিনি থেকে ঝগড়া করে আমাকে ফেলোশিপ দিলেন।_বাংলাদেশে নাফিল্ড ফেলোশিপ পাওয়া আমিই প্রথম ডাক্তার। ওদের এ রকম বৈষম্যের রোষানলে বেশীদিন টিকে থাকা সম্ভব ছিল না।

শরীফা বুলবুল : একদিন অনুপস্থিত হয়ে যেতে হবে, এ বেদনা নেই আপনার ?

ডা. নুরুল ইসলাম : না, সেটা আমি ভাবিই না। একদিন তো যেতেই হবে এটা তো মানতেই হবে। সেজন্য কিছু রেখে যেতে হবে আরো বেশী করে। যেতে হবে বলেই তো রেখে যেতে হবে।

জামাল উদ্দিন : আমাদের দেশের প্রায় ডাক্তারই আপনাকে ভয় পায়, কেন ভয় পায় জানিনা, আপনার দৃষ্টিতে চট্টগ্রামের কয়েকজন ভালো চিকিৎসকের নাম বলবেন কী ?

ডা.নুরুল ইসলাম : ভাল চিকিৎসক বেশ কয়েকজনই আছেন। যেমন আমার সমবয়সী বা তার কাছাকাছি সবাই আমার ছোট। কাছাকাছি ছিলেন ডা. নুরুন্নবী প্রফেসর ছিলেন, এখন তিনি আবার একটা চাকরীতে যোগদান করেছেন। তাকে আমি ভালো চিকিৎসক বলে মনেকরি। ডা.আমিনুল ইসলাম আমার ছাত্র, লোক হিসেবেও ভালো, চিকিৎসক হিসেবেও ভালো। ডা.মাহবুব কামাল চিকিৎসক হিসেবেও ভালো, ডাক্তার হিসেবেও ভালো, চক্ষু চিকিৎসক রবিউল হোসেনকে আমি

মনেকরি একজন ভালো সংগঠক। মানুষ হিসেবেও ভালো। আমাদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি হলেও আমি তাকে ভুল বুঝিনি। আমি মনেকরি তিনি একজন পারদর্শী এবং ভালো সংগঠক বলে চক্ষু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। কেউ যদি কারো বদনাম করে আমি তাকে বলি, প্রথমে দেখুন যে সে কি করে- সে কি করতে পেরেছে, সেটা বিচার করে আপনি বদনাম করতে পারবেন। অনেকে যারা তার বদনাম করে তাদের হয় ঐরকম হওয়ার ক্ষমতা নাই। ফলে করতে পারেনা সেজন্য সেটা স্বীকার করে না। ঈর্ষা করে। ভালো চিকিৎসক বেশ কয়েকজন আছে, এদের বেশীর ভাগই আমার ছাত্র। সেটা আমার জন্যও খুব গৌরবের। পিজির দীপ্তি আমার ছাত্রী, ইমরান বিন নুর উদ্দিন আমার ছাত্র, ওদের চাইতে ওদের বাবার সাথে সম্পর্ক ছিল বেশী। আমি বেশী পুরনো হওয়ায় বর্তমান প্রজন্মের সাথে আমার সম্পর্ক অতি ক্ষীণ। তাদের মা বাবার সাথে আমার সম্পর্ক ছিল গভীর।

শরীফা বুলবুল : জেনেছি আপনি সাংস্কৃতিক অঙ্গনের মাঝেও বিচরণ করেছেন, নাটক করেছেন, গান করেছেন, এ প্রসঙ্গে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলবেন কি ?

ডা. নুরুল ইসলাম : একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। নারিন্দার ডাক্তার মোহাম্মদ গিয়াসুদ্দীন আমার অনেক দিনের বন্ধু। আমাদের দু'জনের নাটক করার শখ ছিল। ঢাকায় চাকরি জীবনের গোড়ার দিকে আমরা একটি বিশেষ নাটকে অংশ নিয়েছিলাম। নাটকের একটি দৃশ্যে রেগে তাকে লাথি মেরে ফেলে দিতে হবে আমার। রিহার্সেলে শিখে নিয়েছিলাম কতটা জোরে লাথি মারতে হবে। কিন্তু নাটকটা মঞ্চস্থ করার সময় আমি ভুলে তাকে এমন জোরে লাথি মেরে দিলাম, আমার লাথি খেয়ে সে ধপ্ করে পড়ে গেল। সত্যি বলতে কি সে লাথিতে আমি নিজেও কিছুটা আঘাত পেয়েছিলাম। আমি স্কুল জীবনেই প্রথম নাটক করি। তারপর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে বেশ কয়েকটি নাটকে অংশ নিই। বিলাত থেকে এম.আর.সি.পি পাস করে জাহাজে করে দেশে ফেরার সময়, যেমন খুশি সাজ প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করি। তাছাড়া মেডিক্যাল কলেজে পুনর্মিলনী উৎসবে গাইনোকলজির অধ্যাপক এ.এফ. নুরুল ইসলাম এবং আরও কিছু ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে কোরাসে অংশ নিই। সে সময় ডাক্তার বদরুদ্দোজা চৌধুরী (সাবেক প্রেসিডেন্ট) রচিত ডায়াগনোসিস নাটকের প্রধান চরিত্র কার্ডিওলজিস্ট-এর ভূমিকায় অভিনয় করি। জীবনের বহু ছোট-খাট ঘটনা ঘটে গেছে যা আজ আর তেমন মনে করতে পারি না।

শরীফা বুলবুল : আপনার ছেলেবেলার এমন কোন ঘটনা মনে পড়ে কি, যে ঘটনা মনে পড়লে আপনি আবেগ তাড়িত হন ?

ডা. নুরুল ইসলাম : আমি তখন সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি। বাৎসরিক পরীক্ষা দিচ্ছিলাম। মাঝে মাঝে ক্লাসে কিছু বন্ধুকে নানা বিষয়ে আলাপ করতে দেখতাম। দু'ইঞ্চি

প্রশ্নের লম্বা কাগজে খুব ছোট ছোট করে লিখে বিশেষভাবে ভাজ করে সহজে উল্টান যায় মত হাতের মুঠোয় রাখার কায়দা রপ্ত করে নিয়েছিলাম। সেদিনের বিষয় ছিল ইতিহাস। ছোট কাগজে প্রথমবারের মত কয়েকটি ঐতিহাসিক তারিখ লিখে নিয়ে পরীক্ষার হলে ঢুকলাম। সঙ্গে সঙ্গে বুক ধড়ফড় শুরু করলো। যদি ধরা পড়ি তাহলে লজ্জায় অপমানে চেহারা দেখান দায় হবে। কিছুক্ষণ পর অনুমতি নিয়ে টয়লেটে গিয়ে কাগজটা ফেলে দিতেই শরীরটা হালকা মনে হল। সেটাই ছিল জীবনের প্রথম এবং শেষ নকল।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম

ভারতের গোয়ায় অবস্থিত National Organization for Tobacco Elimination (NOTE) কর্তৃক জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম মহাত্মা গান্ধী পুরস্কারে ভূষিত হন।

রয়েল কলেজ অব ফিজিসিয়ান

যুক্তরাজ্যে চিকিৎসা ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক প্রতিষ্ঠান "রয়েল কলেজ অব ফিজিশিয়ান"। ইংল্যাণ্ড স্কটল্যাণ্ড, আয়ার ল্যান্ডে একটি করে তিনটি রয়েল কলেজ ছিল। এর মধ্যে স্কটল্যান্ডের এডিনবরা রয়েল কলেজ ছিল প্রাচীনতম। এ কলেজে ১৯৭৫ সালে ইন্টারন্যাশনাল এডভাইজার নিয়োগ করা হয় এবং অধ্যাপক ইসলামকে একজন সদস্য হিসেবে মনোনয়ন পান। প্রায় তিন দশক ধরে এ সম্মানের অধিকারী হিসেবে তাঁর নীতিনির্ধারক কমিটির নানা সভায় যোগদান করার সুযোগ ঘটে। নির্ধারিত সময়ের পর নতুন এডভাইজার নিয়োগ করার নিয়ম থাকলেও অধ্যাপক ইসলামকে Emiritus adviser নিয়োগ করা হয়। বস্তুত এ উপাধি প্রথমবার প্রবর্তন করা হয়। এটা তাঁর জন্য একটা বিরল সম্মান এবং দেশের জন্য গৌরবের।

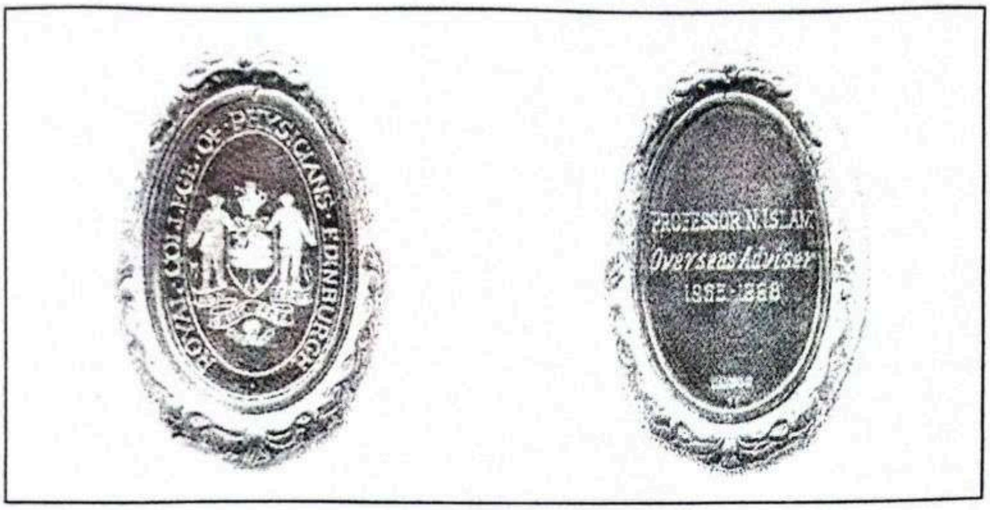

রয়েল কলেজ অব ফিসিশিয়ানস অব এডিনবার্গ এর প্রেসিডেন্ট প্রফেসর জেমস সি পেট্রি ডাঃ নুরুল ইসলামকে ১৯৬০-১৯৯৮ সাল পর্যন্ত উক্ত কলেজে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৯৯ সালে বিশেষ সম্মাননা এমিরেটাস ওভারসিজ রিজিওনাল এডভাইজার-এ ভূষিত করেন।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সাথে তিনি নানাভাবে জড়িত। শুরুতে তিনি ছিলেন রিসার্চ বডি'র একজন সদস্য। পরে তিনি Health man power development এর বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা কমিটির সদস্য হিসাবে প্রায় দশ বছর কর্তব্য পালন করছেন।

আধূনিক ও WHO

ও১৯৮৭ সালে ধূমপান বিরোধী আন্দোলন 'আমরা ধূমপান নিবারণ করি"- আধূনিক তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। অতি অল্পসময়ে ধূমপান বিরোধী আন্দোলনে বাংলাদেশে তিনি কয়েকটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেন। যেমন-

* বঙ্গভবনকে ধূমপান মুক্ত এলাকা ঘোষণা করার জন্য তৎকালীন রাষ্ট্রপতি হোসেন মোঃ এরশাদকে রাজী করান।

* রেডিও এবং টেলিভিশনকে ধূমপান মুক্ত এলাকা ঘোষণা করার জন্য সরকারকে রাজী করান।

* তামাক চাষকে নিরুৎসাহীত করে বিকল্প চাষের সুপারিশ করা হয় কৃষি গবেষণার মাধ্যমে। ঐতিহাসিক এই সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের জন্য তিনি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেন। এবং

১৯৯০ সালে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সনদ ও মেডেলে ভূষিত হন। ১৯৯২ সালে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া'র মাধ্যমে তাঁর কার্যালয়কে তিনি ধূমপানমুক্ত ঘোষণা করাতে সক্ষম হন এবং সরকারকে তামাক বিরোধী আইন প্রণয়নে আগ্রহী করে তোলেন। প্রতিবছর বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসে সেমিনার সিম্পোজিয়াম তিনি সফলতার সাথে সম্পন্ন করেন এবং পরে সকল কর্মসূচি Transiction হিসাবে তা প্রকাশ করেন। ১৯৯২ সালে তিনি দ্বিতীয় বারের মত WHO স্বীকৃতি এবং স্মারক মেডেল পান। এটি এক অনন্য এবং বিরল সম্মান। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আর কেউ এ সম্মান পেয়েছিলেন কিনা তা আমাদের জানা নেই।

International Association for Tobacco or Health (IATH)

এটি একটি লন্ডনভিত্তিক ধূমপান বিরোধী আন্তর্জাতিক সংগঠন। এই সংস্থা কর্তৃক অধ্যাপক ইসলাম বাংলাদেশের Contact person হিসাবে নির্বাচিত। ১৯... সালে গোয়ায় অবস্থিত National Organization for Tobacco Elimination (NOTE) কর্তৃক তিনি গান্ধী পুরস্কারে ভূষিত হন।

Topical Doctor

এটি বৃটেনের স্বনামধন্য অয়েল সোসাইটি অব মেডিসিন কর্তৃক প্রকাশিত একটি আন্তর্জাতিক মানে জার্নাল। উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশে এই প্রথম আন্তর্জাতিক মান রাখার সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের প্রতিষ্ঠিত বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে International Editorial Advisory Board গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে অধ্যাপক ইসলাম এই Board এর সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়ে আছেন এর জন্মলগ্ন থেকে অদ্যাবধি। চিকিৎসা পেশায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থানের এটা একটি মানদণ্ড।

স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার। ১৯৯৭ সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলামকে 'স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার ১৯৯৭'এ ভূষিত করা হয়।

সমাজসেবায় অনন্য অবদানের জন্য অন্যতম রাষ্ট্রীয় পদক 'সমাজসেবা পদক'। চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট সমাজ সেবায় তাঁর অনন্য অবদানের স্বীকৃতিসরূপ ১৯৯৯ সালে জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলামকে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এই পদক প্রদান করা হয়।

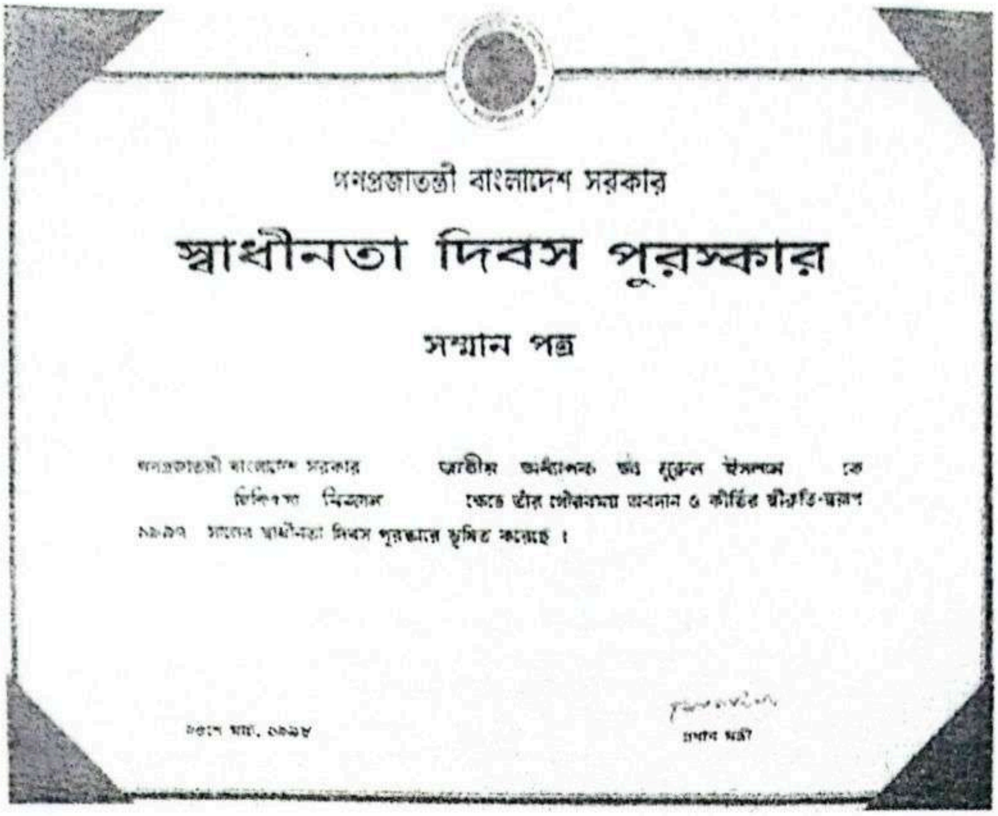

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার

সম্মান পত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম কে চিকিৎসা বিজ্ঞান ক্ষেত্রে তাঁর গৌরবময় অবদান ও কীর্তির স্বীকৃতি-স্বরূপ ১৯৯৭ সালের স্বাধীনতা দিবস পুরস্কারে ভূষিত করেছে।

২৬শে মার্চ, ১৯৯৮

প্রধান মন্ত্রী

জাতীয় ডা. নুরুল ইসলামকে প্রদেয় স্বাধীনতা পুরস্কার ১৯৯৭-এর সম্মান পত্রের আলোকচিত্র

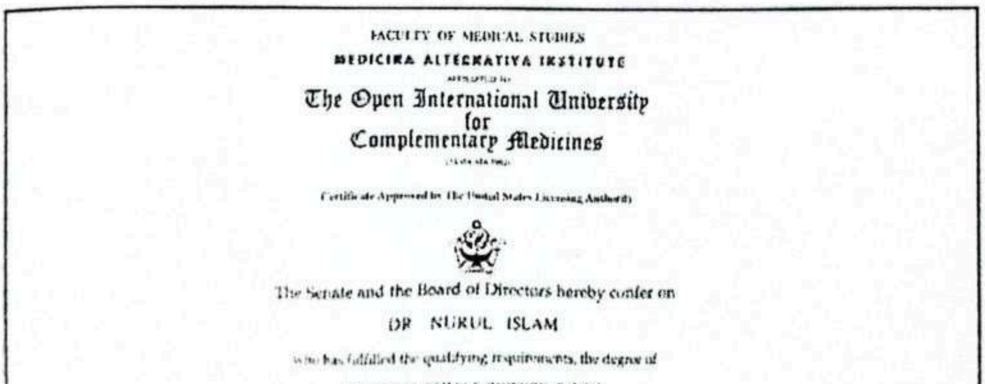

FACULTY OF MEDICAL STUDIES

MEDICINA ALTERNATIVA INSTITUTE

The Open International University for Complementary Medicines

Certificate Approved by The United States Licensing Authority

The Senate and the Board of Directors hereby confer on

DR NURUL ISLAM

who has fulfilled the qualifying requirements, the degree of

DOCTOR OF SCIENCE (HONORIS CAUSA)

with all the rights, honours and privileges pertaining to this degree. In testimony whereof, we have hereto subscribed our names and caused the seals of The Open International University for Complementary Medicines and Medicina Alternativa Institute to be hereto affixed

Given

Colombo, January 2000

চিকিৎসা বিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য 'ওপেন ইউনিভার্সিটি ফর কমপ্লিমেন্টারি মেডিসিন'-শ্রীলংকা ২০০০ সালের জানুয়ারি মাসে অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলামকে বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ খেতাব সম্মানসূচক ডি.এসসি. ডিগ্রি প্রদান করে।

World Health Organization
Organisation mondiale de la Santé

For achievement worthy of international recognition
in promoting the concept of tobacco-free societies,
a Commemorative Certificate and Medal are awarded to:

Prof Nurul Islam

on World No-Tobacco Day,
31 May 1990

H. Naka

Hiroshi Nakajima, M.D., Ph.D
Director-General
Geneva

তামাকমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ১৯৯০ সালের ৩১ মে বিশ্বতামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে প্রফেসর ডা. নুরুল ইসলামকে এই বিশেষ সম্মাননা প্রদান করে।

World Health Organization
Organisation mondiale de la Santé

For achievement worthy of international recognition
in promoting the concept of tobacco-free societies,
a Commemorative Certificate and Medal are awarded to:

Doctor N Islam

on World No-Tobacco Day,
31 May 1992

H. Naka

Hiroshi Nakajima, M.D. Ph.D
Director-General
Geneva

তামাকমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় তাৎপর্যপূর্ণ অবদানের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১৯৯২ সালের ৩১ মে প্রফেসর নুরুল ইসলামকে এই বিশেষ সম্মাননা প্রদান করে।

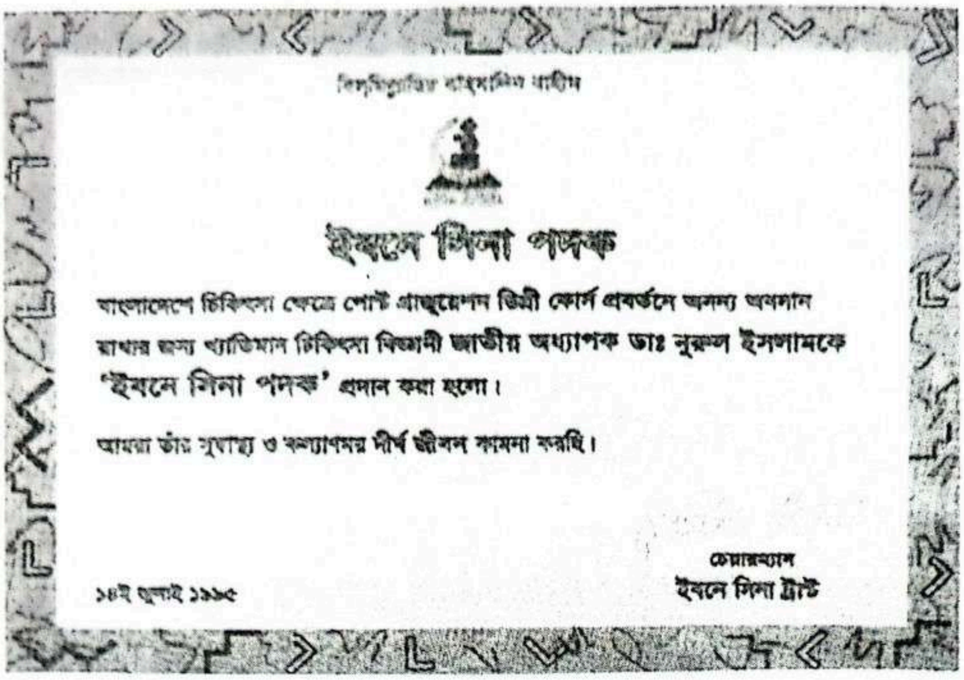

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইবনে সিনা পদক

বাংলাদেশে চিকিৎসা ক্ষেত্রে পোস্ট গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তনে অনন্য অবদান রাখার জন্য খ্যাতিমান চিকিৎসা বিজ্ঞানী জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলামকে 'ইবনে সিনা পদক' প্রদান করা হলো।

আমরা তাঁর সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণময় দীর্ঘ জীবন কামনা করছি।

১৪ই জুলাই ১৯৯৫

চেয়ারম্যান
ইবনে সিনা ট্রাস্ট

বাংলাদেশে চিকিৎসা ক্ষেত্রে পোস্ট গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি কোর্স প্রবর্তনে অনন্যাসাধারণ অবদান রাখার জন্য খ্যাতিমান চিকিৎসা বিজ্ঞানী জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলামকে ১৯৯৫সালে 'ইবনে সিনা পদক' প্রদান করা হয়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে অনন্য অবদানের জন্য জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলামকে ওয়াসিকা-ই-আত্রাব (সর্বগুণে গুণান্বিত পদক) প্রদান করছেন করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ডক্টর এহসান রশীদ। মাঝে হামদর্দ প্রতিষ্ঠাতার পুত্র হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ।

জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নূরুল ইসলাম-এর সাম্প্রতিক প্রাপ্তি ও কর্মকাণ্ডের কিছু আলোকচিত্র

কলকাতায় অনুষ্ঠিত বিশ্ববাংলা সাহিত্য সংস্থা ও বিশ্ব বাঙালি সম্মেলনের পঞ্চম মহাসম্মেলনে সম্মানিত উত্তরীয় এবং মেডেল পরিহিত জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম।

বিশ্ববাংলা সাহিত্য সংস্থা ও বিশ্ববাঙালি সম্মেলনের পঞ্চম মহাসম্মেলনে ভারতের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ ড. প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র মহোদয়ের কাছ থেকে 'ডা. বিধান চন্দ্র রায়' পুরস্কার গ্রহণ করছেন জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম।

বিশ্ববাংলা সাহিত্য সংস্থা ও বিশ্ববাঙালি সম্মেলনের পঞ্চম মহাসম্মেলনে পুরস্কৃত ও সংবর্ধিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রথম সারিতে বাঁ দিক থেকে রয়েছেন কবি অমল কর, কবি মোঃ আব্দুল খালেক, কবি ও শিল্পী ঋষিণ মিত্র, জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম, ড. প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র, সাবেক মন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক এমপি ও অধ্যাপক ড. অমলেন্দু দে প্রমুখ।

পশ্চিমবঙ্গের চুরলিয়ায় নজরুল একাডেমীর পক্ষ থেকে জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলামকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ।

কবিপত্নী প্রমীলা নজরুল ইসলাম-এর সমাধি পাশে জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম ও অন্যান্যরা।

জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের সমাধি পাশে কবি'র চিকিৎসক এবং জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম।

জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের সমাধির সামনে কবি'র চিকিৎসক এবং জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম।

জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের স্মৃতিমূর্তিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করছেন জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম।

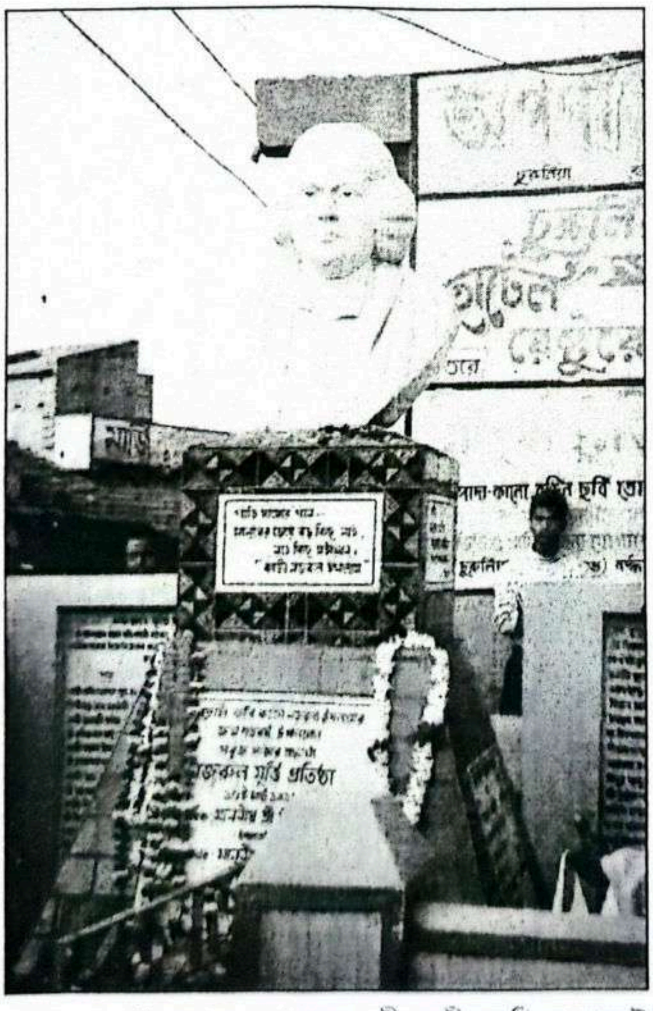
জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলামের ক্যামেরায় বন্দী জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের স্মৃতিমূর্তি

বলাকা
ISBN-984-8433-08-2